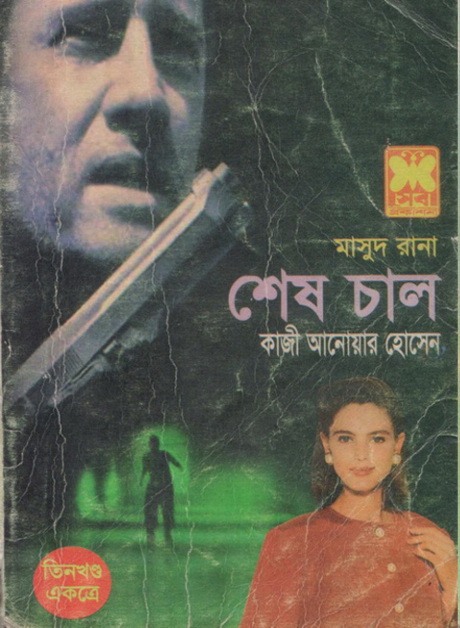


মাসুদ রানা

(তিনখণ্ড একত্রে)

শেষ চাল

কাজী আনোয়ার হোসেন

সুন্দরী মরুকন্যা নিমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে মাসুদ রানা কি চার হাজার বছর আগেকার এক ফারাও সম্রাটের বিত্তবৈভব উদ্ধার করতে আফ্রিকা যাবে? বিপদটা কী ধরনের জানার পরও?

প্রায় চার হাজার বছর আগে ক্রীতদাস টাইটা যা করেছিল, মাসুদ রানাও তাই করতে চাইছে–গিরিখাদের ভিতর ডানডেরা নদীতে একটা বাঁধ দেবে। নদীর তলায়, পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা ফাটল আছে; সেই ফাটলের ভিতর কোথাও থাকলেও থাকতে পারে ফারাও মামোসের সমা ও গুপ্তধন।

সমস্ত বিপদ পায়ে দলে ওরা যখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত, সরকা সৈন্য নিয়ে হামলা করে বসলেন কর্নেল ঘুমা, জার্মান ধনকুবের হেস ডুগার্ড ফারাও মামোসের সমস্ত গুপ্তধন রানার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চান। একই সঙ্গে শুরু হলো তুমুল মরশুমি বর্ষণ, সমাধির ভিতর চিরকালের জন্য আটকা পড়তে হলো ওদেরকে। বেইমানীর আভাস পে রানা, প্রশ্ন উঠল, শেষ হাসিটা কে হাসবে? কে দেবে শেষ চাল?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৪৪/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৪/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫০/-
১৫৮-১৬২	সমরসীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৪৬/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৪৭/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৬২/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫	আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৪১/-
১৮৮-১৮৯-১৯০	শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৫৪/-
১৯১-১৯২	দংশন-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৯৫-১৯৬	ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
১৯৭-১৯৮	তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০	ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২০১-২০২	আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
২০৩-২০৪	অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
২০৫-২০৬-২০৭	জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৫৩/-
২০৮-২০৯	সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১	গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪	নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২১৭-২১৮	অন্ধশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০	দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২	কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪	কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬	নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮	বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০	স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৪০/-
২৩১-২৩২-২৩৩	রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৩৪-২৩৫	অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৩৬-২৩৭	ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৩১/-
২৩৮-২৩৯	নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১	সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২৪২-২৪৩-২৪৪	কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৪৫-২৪৬	নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৫৪-২৫৫	সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭	অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪	হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫	রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৪৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১	কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৪৮/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮	শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫	বিপর্যায়+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১	অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩	মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৩৯/-
২৭৪-২৭৫	প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৪৬/-
২৭৬-২৯১	মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৯-২৮২	মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯	ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৩৮/-
২৮১-২৭৭	আক্রান্ত দূতাবাস+শয়তানের ঘাঁটি	৪৬/-
২৮৩-২৮৮	দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৩৮/-
২৮৪-৩১২	মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৯২-২৯৮	রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৩৭/-
২৯৪-৩০৪	কর্কটের বিষ+ার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭	বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬	শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৪২/-
২৯৯-২৭৮	কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২	বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০৮-৩৪২	পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৪৭/-
৩৩২-৩৩৩	টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩১-৩৪১	ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৪২/-

শেষ চাল-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

এক

মরু থেকে চুপিচুপি গড়িয়ে চলে এল গোধূলি, সারি সারি বালিয়াড়ি ঢাকা পড়ে গেল রক্ত-বেগুনি ছায়ায়। যেন মোটা একটা মখমলের চাদরে চাপা পড়ল সমস্ত শব্দ, আর তাই কোমল প্রশান্তি আর মৌন নিস্তব্ধতার ভেতর বিষণ্ণ সন্ধে ঘনাল।

বালিয়াড়ির চূড়ায় যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মরুদ্যান আর মরুদ্যানকে ঘিরে থাকা ছোট্ট গ্রামটা পরিষ্কার দেখা যায়। প্রতিটি বাড়িই সাদা, ছাদগুলো সমতল। গায়ে গায়ে প্রচুর খেজুর গাছ, মুসলমানদের মসজিদ আর কপটিক ক্রিশ্চানদের চার্চটাই শুধু ওগুলোর চেয়ে বেশি উঁচু। ধর্মীয় বিশ্বাসের দুই স্তম্ভ লেকের দু'ধারে পরস্পরের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে।

লেকের পানি গাঢ় হচ্ছে, ডানা ঝাপটানোর দ্রুত শব্দ তুলে এক ঝাঁক হাঁস নলখাগড়া ঢাকা পাড়ের কাছাকাছি নামতে ছলকানো পানি সাদা দেখাল।

ভদ্রলোকের বয়স বিয়াল্লিশ, যথেষ্ট লম্বা, কপালের দু'পাশে কিছু চুলে পাক ধরেছে। আজও তিনি বিয়ে করেননি, বোধহয় চিরকুমার থাকারই ইচ্ছে। মেয়েটির বয়েস ছাব্বিশ, একহারা গড়ন, হরিণীর মতই সতর্ক ও প্রাণচঞ্চল। আরব রমণীর সমস্ত সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য ধরা দিয়েছে ওর চেহারায়, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও শালীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার মিশরীয় ঐতিহ্যকে অত্যন্ত মূল্য দেয়।

'চলো, এবার ফিরি। দেরি করলে সালিমা রেগে যাবে।' মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হাসলেন ভদ্রলোক। তাঁর ভাইঝি ও। সম্পর্ক যাই হোক, দু'জনের একই পেশা, এবং পেশার প্রতি দু'জনেই তারা নিবেদিত, ফলে স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাশাপাশি নিবিড় একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। প্রিয় পেশায় ভাইঝিকে সহকারিণী হিসেবে পেয়ে ঘালি হাসলান খুশি ও তৃপ্ত। আর আল নিমা, মেয়েটি, চাচা ঘালি হাসলানের সাংঘাতিক ভক্ত, তাঁকে মিশরের সবচেয়ে সৎ ও আদর্শপুরুষ বলে মনে করে ও।

বালির ঢাল বেয়ে নামার সময় কোঁকড়ানো চুলের ফিতে খুলে দিয়ে ছুটল নিমা, এলো চুল বিশাল কালো পতাকার মত পতপত করছে পিছনে, গোড়ালি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ফুলে উঠল সালোয়ার, চুলের সঙ্গে উড়ছে ওড়নার দুই প্রান্ত। ঢাল বেয়ে ছুটছে আর খিল খিল করে হাসছে নিমা। খানিক দূর নামার পরই তাল হারিয়ে ফেলল, আছাড় খাবার পর দু'বার গড়ান দিয়ে আবার সিধে হয়ে ছুটল, আগের মতই হাসছে।

বালিয়াড়ির মাথা থেকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন হাসলান। নিমা এখনও মাঝে মধ্যে এরকম শিশু হয়ে ওঠে। তবে তিনি ওর গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গেও পরিচিত। ভাইঝির এই দু'রকম মূর্তই তিনি পছন্দ করেন, তবে ওর ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে মনে খানিকটা শঙ্কিতও বোধ করেন। তাঁদের বংশের অনেক মেয়েরই এই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী ব্যক্তিত্ব বা স্বভাব ছিল, তাদের কেউ কেউ বিয়ে

গ্রামের শেষ মাথায় নিজ পরিবারে ফিরে গেছে বৃদ্ধা সালিমা, রাত দশটার দিকে নিজেই দু'কাপ কফি বানাল নিমা। কফির কাপে চুমুক দেয়ার সময় টুকটাক আলাপ হলো। সম্পর্কটা বন্ধুর মত, তাই এমন কোন আলোচ্য বিষয় নেই যা নিষিদ্ধ। ইংল্যান্ড থেকে আর্কিওলজিতে ডক্টরেট নিয়ে মিশরে ফেরার পর পরীক্ষা দিয়ে ডিপার্টমেন্ট অভ অ্যান্টিকুইটিজ-এ চাকরি পেয়েছে নিমা। ঘালি হাসলান ওই ডিপার্টমেন্টেরই ডিরেক্টর।

হাসলান যখন নোবলস উপত্যকার কবর খনন করেন নিমা তখন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ছিল। ওটা ছিল রানী লসট্রিস-এর সমাধি, খ্রিস্টের জন্মের সতেরোশো আশি বছর আগেকার।

সমাধির সমস্ত জিনিস প্রাচীনকালেই চুরি হয়ে গেছে, এটা দেখে হতাশ হন হাসলান। নিমাও খুব কাতর হয়ে পড়ে। থাকার মধ্যে আছে শুধু দেয়াল ও সিলিং ঢাকা মিউরাল বা দেয়ালচিত্র।

স্তম্ভের পিছনের দেয়ালে নিমাই তখন কাজ করছিল, যেখানে এককালে দাঁড়িয়ে ছিল সারকোফ্যাগাস–ভাস্কর্যশিল্প-অলঙ্কৃত ও শিলালিপিসমৃদ্ধ পাথুরে শবাধার। মিউরাল-এর ফটো তুলছে ও, এই সময় একদিকের দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ল, বেরিয়ে পড়ল দশটা কুলঙ্গি বা দেয়ালে তৈরি ছোট খোপ। দেখা গেল দশটা কুলঙ্গিতে দশটা তেল চকচকে স্বচ্ছ জার রয়েছে। প্রতিটি জারে পাওয়া গেল একটা করে প্যাপাইরাস। ক্ষয়-ক্ষতি কিছু হলেও, প্রায় চার হাজার বছর পর আশ্চর্য অটুট অবস্থায় আজও টিকে আছে।

কি আশ্চর্য ও বিস্ময়কর কাহিনীই না বলা হয়েছে ওগুলোয়। শক্তিশালী ও সুদক্ষ শত্রু-বাহিনী আক্রমণ করল একটা জাতিকে, এবং যুদ্ধে ব্যবহৃত হলো ঘোড়া আর ঘোড়ায় টানা রথ। এর আগে মিশরীয়রা ঘোড়া দেখেনি। হিকসস বাহিনীর দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত নীলনদের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ পালাতে বাধ্য হলো। নেতৃত্ব দিল ওদের রানী, রানী লসট্রিস; বিশাল নদী অনুসরণ করে দক্ষিণ দিকে চলে এল, চলে এল প্রায় নদীর উৎসে, ইথিওপিয়ান হাইল্যান্ডের নির্দয় পাহাড়ী এলাকার গভীরে। এখানে, প্রবেশ নিষিদ্ধ পাহাড়শ্রেণীর ভেতর, রানী লসট্রিস তাঁর স্বামীর মমি করা দেহ সমাধির ভেতর সংরক্ষণ করলেন। তাঁর স্বামী, ফারাও মামোস, যুদ্ধে হিকসস বাহিনীর হাতে নিহত হন।

বহু বছর পর রানী লসট্রিস তাঁর প্রজাদের নিয়ে উত্তর অভিযানে বেরোন, আবার ফিরে আসেন মিশরে। এবার ওঁদের কাছে নিজস্ব ঘোড়া আর রথ আছে, দুর্গম আর নিষ্ঠুর আফ্রিকান প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে দক্ষ হয়েছে যোদ্ধারা, সুদীর্ঘ নদীর তীর ধরে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের মত ছুটে এসে হানাদার হিকসস বাহিনীকে আরেকবার চ্যালেঞ্জ করে বসল। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে হার হলো হিকসসের, তার কবল থেকে ছিনিয়ে নেয়া হলো আপার ও লোয়ার ঈজিপ্ট।

এই গল্প নিমার অস্তিত্বের অণু-পরমাণুতে শিহরণ জাগায়। প্যাপাইরাসে বদ্ধ ক্রীতদাসের আঁকা চিত্রলিপি বা হায়ারোগ্লিফের অর্থ ধীরে ধীরে একটু একটু করে উদ্ধার করে ওরা, আর প্রতি মুহূর্তে মুগ্ধ বিস্ময়ে রোমাঞ্চিত হতে থাকে ও।

কায়রোয়, মিউজিয়ামে, সারাদিন রুটিন কাজ করার পর এই ভিলায় রোজ

রাতে স্ক্রোল নিয়ে বসে ওরা। দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেছে, তবে নিষ্ঠা আর অধ্যবসায়ের ফলও পেয়েছে, দশটা স্ক্রোলের পাঠোদ্ধার করা গেছে–বাকি আছে শুধু সপ্তম স্ক্রোল। এটা আসলে হেঁয়ালিতে ভরা, লেখক গূঢ় রহস্যময় সাঙ্কেতিক ভাষায় এমন সব ঘটনার কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে গেছে যে এত কাল পর কার সাধ্য অর্থ বের করে। নিজেদের কর্মজীবনে হাজার হাজার টেক্সট স্টাডি করেছে ওরা, কিন্তু সপ্তম স্ক্রোলে টাইটা এমন সব সিম্বল বা প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছে যা আগে কখনও ওদের চোখে পড়েনি। এখন ওরা দু'জনেই জানে যে টাইটা চেয়েছিল তার প্রিয় রানী ছাড়া আর কেউ যেন এর অর্থ করতে না পারে। মনোহারিণী রানীকে দেয়া এগুলো ছিল তার শেষ উপহার, যে উপহার রানী সঙ্গে করে কবরে নিয়ে যাবেন।

দু'জনের এক করা মেধা, কল্পনাশক্তি আর শ্রম কয়েক বছর ধরে কাজে লাগিয়ে অবশেষে একটা উপসংহারে পৌঁছুতে যাচ্ছে ওরা। অনুবাদে এখনও অনেক ফাঁক রয়ে যাচ্ছে, কিছু অংশের পাঠ সঠিক হলো কিনা সন্দেহ আছে, তবে পাণ্ডুলিপির মূল কাঠামোটা এমন ভঙ্গিতে সাজিয়েছে ওরা যে তা থেকে বক্তব্যের সারমর্মটুকু বের করে নেয়া সম্ভব।

এই মুহূর্তে কফির কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর মাথা নাড়ছেন হাসলান, যেমন আগেও বহুবার করেছেন তিনি। 'সত্যি আমি ভয় পাচ্ছি,' বললেন। 'এটা বিশাল একটা গুরু দায়িত্ব। বছরের পর বছর রাত জেগে যে জ্ঞান আমরা অর্জন করলাম, এটা নিয়ে কি করা হবে। এ যদি মন্দ কোন লোকের হাতে পড়ে…' কথা শেষ না করে চুমুক দিলেন আবার, দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এমন কি আমরা যদি ভাল কোন লোককেও দেখাই, প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো এই গল্প সে কি সত্যি বলে বিশ্বাস করবে?'

'কাউকে দেখাবার দরকার কি?' নিমার কথায় সামান্য হলেও ক্ষোভ বা ঝাঁঝ প্রকাশ পেল। 'যা করার আমরা করলেই তো পারি।' মাঝে মধ্যে এ-ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা সবচেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাসলানের বয়েস হয়েছে, কাজেই তিনি সতর্ক ও সাবধান। আর নিমার আচরণে তারুণ্যের অস্থিরতা প্রকাশ পায়।

'তুমি বুঝবে না, নিমা,' বললেন তিনি। যখনই তিনি এ-কথা বলেন, অস্বস্তি বোধ করে নিমা। আরব পুরোপুরি পুরুষদের জগৎ, মর্যাদার সমান ভাগ মেয়েদেরকে তারা এখনও দিতে শেখেনি। অথচ আরেক জগতের সঙ্গে পরিচয় আছে নিমার, যেখানে মেয়েরা সমান মর্যাদা দাবি করে এবং পায়ও–দান হিসেবে নয়, অধিকার হিসেবে। দুই জগতের মাঝখানে আটকা পড়ে গেছে নিমা, পশ্চিমা জগৎ আর আরব জগৎ।

নিমার মা ইংরেজ মহিলা, কায়রোর ব্রিটিশ দূতাবাসে কাজ করতেন। ওর বাবা মিশরীয়, কর্নেল নাসেরের সরাসরি অধীনে একজন তরুণ অফিসার ছিলেন। পরস্পরকে ভালবাসেন ওঁরা, তারপর বিয়ে করেন। যদিও ওদের দাম্পত্য জীবনটা সুখের হয়নি।

ওর মা চেয়েছিলেন তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে ইংল্যান্ডের ইয়র্কে, নিজের

জন্মস্থানে। চেয়েছিলেন জন্মসূত্রে তাঁর সন্তানের ব্রিটিশ নাগরিকত্ব থাকা চাই। মা-বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর মায়ের জেদে ইংল্যান্ডে গিয়ে স্কুলে ভর্তি হতে হয় নিমাকে, তবে প্রতিটি দীর্ঘ ছুটি কায়রোয় বাবা ও চাচার সঙ্গে কাটিয়েছে ও। ওর বাবার বিস্ময়কর পদোন্নতি হয়, শেষ দিকে তিনি মোবারক মন্ত্রীসভার সদস্য হতে পেরেছিলেন। বাবাকে অসম্ভব ভালবাসত নিমা, বোধহয় সেজন্যেই বাবা ও আরব সমাজের প্রভাব বেশি পড়ে ওর ওপর। বাল্য ও কৈশোর কাল বেশিরভাগটাই মায়ের সঙ্গে ইংল্যান্ডে কাটালেও মা বা পশ্চিমা সমাজের প্রভাব ওর ওপর খুব কম।

কপটিক সমাজের ঐতিহ্য হলো গুরুজনরা মেয়ের পাত্র ঠিক করবেন। এই ঐতিহ্য মেনে নিয়ে কাউকে ভালবাসার ঝামেলা এড়িয়ে গেছে নিমা। গুরুজন বলতে একমাত্র চাচা হাসলান, তিনি আবার এত বেশি খুঁতখুঁতে যে ভাইঝির উপযুক্ত পাত্র চারদিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে এ নিয়ে নিমার মনে কোন ক্ষোভ বা অস্থিরতা নেই। ও জানে যে চাচা তাঁর দায়িত্ব যথাসময়েই পালন করবেন, এবং পাত্র পছন্দ হলে ওর মতামতও চাইবেন।

শুধু যে বিয়ের ব্যাপারে তা নয়, আরব সমাজের আরও অনেক ঐতিহ্য মেনে চলে নিমা। যেমন নিজের স্বাধীনতা বজায় রেখেও আচার-আচরণ ও পোশাক-আশাকে শালীনতা বজায় রাখে ও। গ্রামের মেয়েদের মত বোরখা পরে না, তবে কয়েক প্রস্থ কাপড়ে শরীর এমনভাবে ঢেকে রাখে যে ওর বিরুদ্ধে মুসলমান বা কপটিক ক্রিশ্চান সমাজের কোন অভিযোগ নেই।

হাসলান আবার কথা বলছেন। তাঁর কথায় মন দিল নিমা। 'মন্ত্রীর সঙ্গে আবার আমি কথা বলেছি, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন বলে মনে হয় না। সম্ভবত ফারুকী তাঁকে বুঝিয়েছে যে আমি একটু পাগলাটে।' বিষণ্ণ হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। করিম ফারুকী তাঁর ডেপুটি, অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী তরুণ, মন্ত্রীসভায় ও প্রশাসনে তার আত্মীয় ও শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা অনেক। 'মিনিস্টার আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, ফান্ড পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই আমাকে দেখতে হবে বাইরে থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় কিনা। সম্ভাব্য স্পনসর হিসেবে তালিকায় চারটে নাম রেখেছি। প্রথমেই বলা যেতে পারে বাফেন মিউজিয়ামের কথা, কিন্তু বিশাল ও নিষ্প্রাণ কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করতে কখনোই আমার ভাল লাগেনি। একা একজন লোকের সাহায্য পেলে খুশি হই। সিদ্ধান্তে আসাটা তাহলে সহজ হয়।' এ-সব কিছুই নতুন নয় নিমার কাছে, তবু মন দিয়েই শুনছে ও।

'তারপর ধরো, হেস ডুগার্ড। তাঁর টাকা আছে, এ বিষয়ে আগ্রহও আছে, কিন্তু তাঁকে আমি এত ভালভাবে চিনি না যে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি।'

'আর আমেরিকান ভদ্রলোক? তিনি তো বিখ্যাত একজন কালেক্টর।'

'ফ্রেড ম্যাকমোহনের সঙ্গে কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। নিজের ভাগ বাড়াবার দিকে এত বেশি ঝোঁক তাঁর, তাঁকে আমার রাক্ষস বলে মনে হয়। সত্যি ভয় পাই।'

'তাহলে বাকি থাকল কে? তালিকার প্রথম নামটা?'

হাসলান জবাব দিলেন না, কারণ উত্তরটা দু'জনেরই জানা। ওঅর্ক টেবিলের দিকে তাকালেন তিনি, জিনিস-পত্র সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। 'দেখে মনে হচ্ছে কত সাধারণ আর নগণ্য। পুরানো একটা প্যাপাইরাস স্ক্রোল, কয়েকটা ফটোগ্রাফ আর নোট বুক, একটা কমপিউটর প্রিন্ট আউট। বিশ্বাস করা কঠিন মন্দ লোকের হাতে পড়লে এই সামান্য ক'টা জিনিস কি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।' আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

তারপর হেসে উঠলেন। 'আমি বোধহয় একটু বেশি ভয় পাচ্ছি। হয়তো রাত জেগে কাজ করার প্রতিক্রিয়া। কি, মা, কাজে ফিরে যাই আবার? আগে পাজি বুড়ো টাইটার পুরো বক্তব্য অনুবাদ করি, তারপর অন্যান্য বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা যাবে, কি বলো?' সামনের স্তূপ থেকে ওপরের ফটোটা হাতে নিলেন। স্ক্রোলের মাঝখানের অংশ দেখানো হয়েছে এতে। 'ভাগ্যই খারাপ, তা না হলে ঠিক এই জায়গার প্যাপাইরাস ভেঙে খসে পড়বে কেন।' চোখে চশমা পরলেন। পড়ছেন নিমাকে শোনাবার জন্যে।

> "সিড়ে বেয়ে হাপির (HAPI) ঠিকানায় পৌঁছুতে হলে অনেকগুলো ধাপ নামতে হবে। কঠিন পরিশ্রম আর অনেক চেষ্টার পর দ্বিতীয় ধাপে পৌঁছুলাম আমরা, তারপর আর এগোলাম না, কারণ এখানেই রাজকুমার একটা দৈববাণী পেল। স্বপ্নের ভেতর তার বাবা, মৃত দেবতা ফারাও, দেখা দিলেন তাকে, এবং জানালেন, 'দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এই জায়গাতেই আমি অনন্তকাল বিশ্রাম নেব।'" '

চোখ থেকে চশমা খুলে নিমার দিকে তাকালেন হাসলান। 'দ্বিতীয় ধাপ,' বললেন তিনি। 'অন্তত এই একবার স্পষ্ট একটা বর্ণনা দিয়েছে টাইটা। সে তার স্বভাবসুলভ হেঁয়ালি এখানে ব্যবহার করেনি।'

'এসো, স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফগুলো দেখি,' বলল নিমা, গ্লসি শিটগুলো নিজের দিকে টেনে নিল। টেবিল ঘুরে ওর পিছনে এসে দাঁড়ালেন হাসলান। 'একটা গিরিখাদে ওরা বাধা পেল। খাদের ভেতর স্বাভাবিক বাধা কি হতে পারে? খানিক পরপর নদীর তলায় ঢাল থাকতে পারে, স্রোত ওখানে প্রবল হবে। কিংবা একটা জলপ্রপাত থাকতে পারে। ওটা যদি দ্বিতীয় জলপ্রপাত হয়, তাহলে এই জায়গায় ছিল ওরা–' স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফের এক জায়গায় আঙুল ঠেকাল নিমা। ওখানে বিশাল দুই পাহাড়ের মাঝখানে সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়েছে সরু একটা নদী।

হঠাৎ মনোযোগ ছুটে গেল নিমার, মাথা তুলল। 'শুনছ, চাচা?' গলার স্বর বদলে গেছে, তীক্ষ্ণ ও সতর্ক শোনাল।

'কি?' হাসলানও মুখ তুললেন।

'কুকুর,' বলল নিমা।

'ওই ব্যাটা দোআঁশলাটা,' বললেন হাসলান, 'ঘেউ ঘেউ করে রাতটাকে ভৌতিক করে তোলে। ওটাকে আর না তাড়ালেই নয়।'

হঠাৎ কারেন্ট চলে গেল। অন্ধকার ঘরে বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেল ওরা। পিছন দিকে পাম গাছের তলায় শেডের ভেতর জেনারেটরের নরম শব্দ থেমে গেছে।

মরু রাতের স্বাভাবিক অংশ হয়ে ওঠায় শুধু থেমে গেলে ওটার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে ওরা।

টেরেসের দরজা দিয়ে তারার অস্পষ্ট আলো ঢুকছে ভেতরে। উঠে গিয়ে দরজার পাশের একটা শেলফ থেকে তেল ভরা ল্যাম্পটা নামালেন হাসলান, জ্বালার পর চেহারায় কৃত্রিম বা সকৌতুক হতাশা ফুটিয়ে নিমার দিকে তাকালেন। 'যাই, দেখে আসি…'

'চাচা,' বাধা দিল নিমা, 'কুকুরটা!'

কয়েক সেকেন্ড কান পেতে শোনার পর একটু উদ্বিগ্ন দেখাল হাসলানকে। কুকুরটা একদম চুপ মেরে গেছে। 'ও কিছু না,' বলে দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

তেমন কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ পিছন থেকে ডাক দিল নিমা, 'চাচা, সাবধান কিন্তু!'

গুরুত্ব না দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন হাসলান, বেরিয়ে এলেন টেরেসে।

বাইরে একটা ছায়া নড়তে দেখল নিমা, ভাবল বাতাসে মাচার ওপর কোন লতা বা ডাল দোল খাচ্ছে। তারপর ওর খেয়াল হলো, রাতটা একদম স্থির, এতটুকু বাতাস বইছে না। এই সময় লোকটাকে দেখতে পেল, ফ্ল্যাগস্টোনের ওপর দিয়ে দ্রুত ও নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। মাছ ভর্তি পুকুরটা পাকা টেরেসের মাঝখানে, ওটাকে ঘুরে এগোচ্ছেন হাসলান; লোকটা তাঁর পিছন দিকে চলে আসছে। 'চাচা!' নিমার চিৎকার শুনে দ্রুত আধ পাক ঘুরলেন হাসলান, উঁচু করলেন ল্যাম্পটা।

'কে তুমি?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'এখানে কি চাও?'

আগন্তুক নিঃশব্দে তাঁর কাছে চলে আসছে। গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা আলখেল্লা ফুলে উঠছে পায়ের চারপাশে, এক প্রস্থ কাপড়ে মাথাটা ঢাকা। ল্যাম্পের আলোয় হাসলান দেখলেন মাথার সাদা কাপড়ের একটা প্রান্ত মুখের ওপর নামিয়ে এনে লোকটা তার চেহারা ঢেকে রেখেছে।

লোকটা নিমার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে, তার হাতের ছুরিটা তাই দেখতে পায়নি ও। তবে হাসলানের পেট লক্ষ্য করে ছোরা মারার ভঙ্গিটা চিনতে পারল। ব্যথায় কাতরে উঠলেন হাসলান, কুঁজো হয়ে গেলেন। আততায়ী ছুরিটা বের করে নিয়ে আবার ঢোকাল, তবে এবার ল্যাম্প ফেলে দিয়ে তার হাতটা ধরে ফেললেন হাসলান।

খসে পড়া ল্যাম্পের শিখা দপদপ আওয়াজ করছে। আলো ও ছায়ার ভেতর ধস্তাধস্তি করছে দু'জন। নিমা দেখতে পেল ওর চাচার সাদা শার্টের সামনের দিকটায় গাঢ় একটা দাগ ছড়িয়ে পড়ছে।

'দৌড় দাও!' চিৎকার করছেন হাসলান। 'যাও, নিমা, যাও! লোকজনকে ডাকো! ওকে আমি ধরে রাখতে পারছি না!' নিমা জানে ওর চাচা নেহাতই শান্ত শিষ্ট একজন ভদ্র মানুষ, জীবনের বেশিরভাগ সময় ঘরে বসে বই-পত্র নিয়ে কাটিয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে লোকটার সঙ্গে তিনি পারছেন না।

'যাও, নিমা, যাও! প্লীজ, নিজেকে বাঁচাও!' গলার আওয়াজই বলে দিল

নিমাকে, হাসলান দুর্বল হয়ে পড়ছেন, তবে এখনও তিনি আততায়ীর ছুরি ধরা হাতটা ছাড়েননি।

আতঙ্কে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল নিমা, হঠাৎ সংবিৎ ফিরতে ছুটল দরজার দিকে। টেরেসে বেরিয়ে এল বিড়ালের মত ক্ষিপ্র বেগে–আততায়ীকে হাসলান আটকে রেখেছেন, লোকটা যাতে নিমার পথ আগলাতে না পারে।

নিচু পাঁচিল টপকে ঝোপের মাঝখানে নামল নিমা, প্রায় সেঁধিয়ে গেল দ্বিতীয় লোকটার আলিঙ্গনের ভেতর। তীক্ষ্ণ চিৎকার দিয়ে মোচড় খেলো, ছিটকে সরে গিয়ে ছুটল আবার। লোকটার লম্বা করা হাতের আঙুল আঁচড় কাটল ওর মুখে। নিজেকে প্রায় ছাড়িয়ে নিয়েছে নিমা, এই সময় আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে আটকে গেল গলার কাছে ওর সূতী কামিজে।

এবার লোকটার হাতে ছুরি দেখতে পেল নিমা, তারার আলো লেগে ঝিক করে উঠল রূপালি একটা লম্বা আকৃতি। ওটা দেখামাত্র মৃত্যু ভয় নতুন শক্তি যোগাল ওকে। ফড় ফড় করে ছিঁড়ে গেল কামিজ, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটছে নিমা–তবে তারপরও একটু দেরি হয়ে গেছে ওর, ছুরির ফলাটাকে পুরোপুরি এড়াতে পারল না। বাহুর ওপর দিকটা চিরে গেছে, বুঝতে পেরে বাঁচার আকুলতা আরও তীব্র হয়ে উঠল, সমস্ত শক্তি এক করে লোকটাকে লাথি মারল নিমা। লাগল শরীরের নিচের দিকে নরম কোথাও, তবে ঝাঁকি খেলো ওর গোড়ালি আর হাঁটু। লোকটা গুঙিয়ে উঠে হাঁটু গাড়ল মাটিতে।

পাম বীথির ভেতর দিয়ে ছুটছে নিমা। প্রথম দিকে খেয়াল থাকল না কোন দিকে যাচ্ছে বা কি উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। ছুটছে যতক্ষণ শক্তিতে কুলায় দূরে সরে যাবার চেষ্টায়। তারপর ধীরে ধীরে আতঙ্কটা নিয়ন্ত্রণে আনল। ঝট করে পিছন দিকে তাকাল, কেউ ওর পিছু নেয়নি। লেকের কিনারায় পৌঁছে ছোটার গতি কমাল, বুঝতে পারছে তা না হলে হাঁপিয়ে যাবে। অনুভব করল কাঁধের নিচে বাহু থেকে গরম রক্ত গড়াচ্ছে, হাত বেয়ে নেমে এসে আঙুলের ডগা থেকে ঝরে পড়ছে টপ টপ করে।

থামল নিমা, বসে হেলান দিল একটা পাম গাছে। এক ফালি কামিজ ছিঁড়ে বাহুর ক্ষতটা বাঁধল, অক্ষত হাতটা এত বেশি কাঁপছে যে কাজটা শেষ করতে অনেক সময় লাগল। বাম হাত আর দাঁত দিয়ে ধরে গিট বাঁধল ব্যান্ডেজে, এখন আর আগের মত রক্ত বেরুচ্ছে না। কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছে না নিমা। এদিক ওদিক তাকাতে একটা জানালা দেখতে পেল, ভেতরে ল্যাম্প জ্বলছে। কাছাকাছি সেচ খালটার পাশে ওটা সালিমার ঘর, চিনতে পারল ও। উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকেই এগোল।

একশো কদমও এগোয়নি, শুনতে পেল পাম বীথির ভেতর কে যেন কাকে আরবীতে বলছে, 'মোমিন, মেয়েলোকটা তোমার এদিকে আসেনি তো?'

সঙ্গে সঙ্গে নিমার সামনের অন্ধকারে একটা টর্চ জ্বলে উঠল, শোনা গেল আরেক লোকের গলা, 'না, এদিকে আসেনি।'

ভাগ্যক্রমে সামনের লোকটার হাতে গিয়ে পড়েনি নিমা। ঝপ করে বসে পড়ল, মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকিয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। ওর পিছনের পাম

বীথির ভেতর থেকে আরেকটা টর্চের আলো এগিয়ে আসছে, ওর ফেলে আসা পথ ধরে। নিশ্চয়ই এই লোকটাকেই লাথি মেরেছিল, তবে এরইমধ্যে আঘাতটা সামলে নিয়েছে।

দু'দিকে বাধা, কাজেই লেকের দিকে ফিরে এল নিমা। রাস্তাটাও ওদিকেই। এত রাতে গাড়ি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, তবে ঈশ্বর চাইলে ত্রাণকর্তা হিসেবে পেয়েও যেতে পারে কাউকে। ছুটতে গিয়ে আছাড় খেলো নিমা, হাঁটুর চামড়া উঠে গেল, লাফ দিয়ে সিধে হয়ে আবার ছুটল।

দ্বিতীয়বার আছাড় খাবার পর হাতে ঠেকল কমলালেবু সাইজের একটা পাথর। আবার ছোটার সময় মুঠোয় থাকল ওটা, অস্ত্র হিসেবে খানিকটা অভয় দিচ্ছে ওকে।

বাহুর ক্ষতটা ব্যথা করছে। চাচার কথা ভেবে কান্না পাচ্ছে। তাঁর আঘাত যে গুরুতর, ও জানে। বাঁচবে তো? যেভাবে হোক চাচার কাছে সাহায্য নিয়ে ফিরতে হবে ওকে। ওর পিছনে পাম বীথির ভেতর টর্চ নিয়ে খোঁজাখুঁজি করছে লোক দু'জন। ক্রমশ এদিকেই এগিয়ে আসছে তারা। খানিক পর পর পরস্পরের সাড়া নিচ্ছে।

একটা নালা থেকে অবশেষে রাস্তার ওপর উঠে এল নিমা। বোধহয় স্বস্তি পাওয়াতেই পা দুটো কাঁপতে শুরু করল, মনে হলো এই পা নিয়ে আর হাঁটতে পারবে না। তবু চেষ্টা করল নিমা। গ্রামের দিকে ঘুরল ও। হাঁটা শুরু করেছে, তবে প্রথম বাঁকে এখনও পৌঁছায়নি, এই সময় গাছপালার আড়াল থেকে ধীরগতিতে এগিয়ে আসতে দেখল একজোড়া হেডলাইটকে। রাস্তার মাঝখান ধরে গাড়িটার দিকে ছুটল নিমা। 'বাঁচান! আরবীতে চিৎকার করছে। 'সাহায্য করুন, প্লীজ!'

বাঁক ঘুরল গাড়িটা। হেডলাইটের আলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার আগে নিমা দেখল গাঢ় রঙের ছোট একটা ফিয়াট ওটা। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে থামানোর জন্যে হাত নাড়ছে ও, হেডলাইটের আলোয় রাস্তাটাকে মনে হচ্ছে থিয়েটারের স্টেজ। সামনে থামল ফিয়াট, ছুটে পাশে চলে এল নিমা, দরজার হাতল ধরে টান দিল : 'প্লীজ, বাঁচান! ওরা...'

দরজা খুলে গেল, লাফ দিয়ে নিচে নেমে নিমার আড়ষ্ট ডান হাতটা খপ করে ধরে ফেলল ড্রাইভার। হ্যাঁচকা টানে ব্যাক ডোরের দরজা খুলল সে। 'মোমিন! আলিজান!' পাম বীথির দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাক দিল। 'মেয়েটাকে পেয়েছি!' মোমিন আর আলিজান সাড়া দিচ্ছে, শুনতে পেল নিমা। দেখল টর্চের আলো ঘুরে গিয়ে এদিকেই সরে আসছে দ্রুত।

ওর ঘাড়ের পিছনে হাত দিয়ে ওকে নত করার চেষ্টা করছে ড্রাইভার, গাড়ির ব্যাক সীটে ঢোকাতে চায়। হঠাৎ খেয়াল হলো নিমার, বাম হাতের মুঠোয় পাথরটা এখনও আছে। একটু ঘুরল ও, শক্ত করল পেশী, মুঠোয় ধরা পাথরটা সজোরে ঠুকে দিল লোকটার মাথার পাশে। শেষ মুহূর্তে খুলি বাঁচাবার চেষ্টা করল সে, ফলে পাথরটা গুড়িয়ে দিল তার কপালের হাড়। বিনা প্রতিবাদে রাস্তার ওপর ঢলে পড়ল লোকটা, তারপর আর নড়ল না।

পাথরটা ফেলে দিয়ে আবার ছুটছে নিমা। হঠাৎ খেয়াল হলো, হেডলাইটের তৈরি আলোর পথ ধরে ছুটছে সে, তার প্রতিটি নড়াচড়া আলোকিত। পাম বীথি থেকে বেরিয়ে এসে ওর পিছু নিয়েছে অপর দুই লোক, চিৎকার করে কি যেন বলছে তারা। পিছন দিকে তাকাতে নিমা দেখল, দ্রুত কাছে চলে আসছে খুনীরা। বুঝতে পারল, বাঁচার একমাত্র উপায় অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া। ঘুরে রাস্তার কিনারায় চলে এল, ঢাল বেয়ে তর তর করে নামছে। নামার গতি নিয়ন্ত্রণে থাকল না, লেকের কোমর সমান পানিতে চলে এল নিমা। আতঙ্ক ও অন্ধকারে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারেনি রাস্তার পাশে লেকের কাছে চলে এসেছে। এখন আর ঢাল বেয়ে রাস্তায় ওঠার সময় নেই। তবে মনে পড়ল, সামনে প্যাপাইরাস আর নল খাগড়া আছে, লুকানোর জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

লেকের গভীরে চলে এল নিমা, পায়ের নিচে মাটি পাচ্ছে না। সাঁতরাচ্ছে ও। গলায় ওড়নাটা নেই, কোথায় খসে পড়েছে বলতে পারবে না। কামিজ আর সালোয়ার খুব বেশি ঢোলা হওয়ায় সাঁতার কাটতে অসুবিধে হচ্ছে। পানির ওপর থাকা নিরাপদ নয় মনে করে কিছুক্ষণ ডুব সাঁতার দিল। সন্দেহ নেই, ইতিমধ্যে রাস্তার কিনারায় পৌঁছে লেকের দিকে তাকিয়ে আছে লোকগুলো।

মাথার ওপর নল খাগড়া ঝোপ পেয়ে থামল নিমা। আরও খানিকটা ভেতরে সরে এল। পানির ওপর শুধু নাকটা তুলে রেখেছে, মুখটা রাস্তার উল্টোদিকে ফেরানো। নিমা জানে ওর কালো চুলে টর্চের আলো প্রতিফলিত হবে না।

কান দুটো পানির নিচে থাকলেও রাস্তার ওপর থেকে লোকগুলোর জোরাল গলা শুনতে পাচ্ছে নিমা। কিনারায় দাঁড়িয়ে নল খাগড়ার ওপর টর্চের আলো ফেলছে, খুঁজছে ওকে। একবার টর্চের আলো ওর মাথার চারপাশে ঘোরাফেরা করল, ডুব দেয়ার জন্যে বড় করে শ্বাস নিল নিমা। তবে না, আলোটা সরে গেল।

মাথা একটু তুলল নিমা, কান দুটো পানির ওপর উঠে এল। লোকগুলো আরবীতে কথা বলছে। যে লোকটার নাম আলিজান তার গলা চিনতে পারল। মনে হলো সেই ওদের লীডার, কাকে কি করতে হবে বলে দিচ্ছে। 'মোমিন, যাও, বেশ্যাটাকে তুলে আনো।'

ঢাল বেয়ে নেমে আসার আওয়াজ পেল নিমা। ছপ ছপ শব্দ তুলে পানিতে নামল মোমিন। 'আরও সামনে,' রাস্তা থেকে বলল আলিজান। 'ওদিকে, নল খাগড়ার ভেতর, আমি যেখানে টর্চের আলো ফেলছি।'

'পানি ওদিকে অনেক গভীর। কেউ আমরা সাঁতার জানি না–তুমিও না।'

'ওই তো, তোমার ঠিক সামনে। নল খাগড়ার ভেতর। আমি ওর মাথা দেখতে পাচ্ছি।' আলিজান উৎসাহ দিল তাকে। ধরা পড়ে গেছে, বুঝতে পেরে যতটা সম্ভব পানির নিচে মাথা নামাল নিমা।

চারদিকে প্রচুর পানি ছিটিয়ে ওর দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মোমিন। অকস্মাৎ 'আল্লাহ রে, আল্লাহ' বলে চিৎকার দিল সে, ঘুরে উঁচু পাড়ের দিকে পালাচ্ছে। কিছু না, নল খাগড়ার ভেতর থেকে এক ঝাঁক হাঁস ভয় পেয়ে সশব্দে ডানা মেলেছে আকাশে। রাস্তা থেকে আলিজান হুমকি-ধামকি দিলেও কাজ হলো না, ইতিমধ্যে ঢালের ওপর উঠে পড়েছে মোমিন, সে আর পানিতে নামতে রাজি

নয়। ঢাল বেয়ে রাস্তায় উঠেছে সে, বলল, 'আসল গুরুত্ব ক্রোলের, মেয়েটার তেমন গুরুত্ব নেই। ক্রোল ছাড়া টাকা পাওয়া যাবে না। মেয়েটাকে পরে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিতে পারব।'

রাস্তার কিনারা থেকে গাড়ির কাছে ফিরে গেল লোকগুলো। উঠে বসল সবাই, গ্রামের দিকে চলে গেল গাড়ি। তারপরও ভয়ে পানি থেকে উঠছে না নিমা, ভাবছে অন্ধকার রাস্তায় ওরা কাউকে পাহারায় রেখে গেছে কিনা। খানিক পর ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে গেল, পানি থেকে না উঠলে মারা যেতে পারে। কিন্তু সাহসে কুলাচ্ছে না, শরীরে শক্তি আছে বলেও মনে হলো না। মরি মরব, দিনের আলো না ফোটা পর্যন্ত পানি ছেড়ে আমি উঠব না।

এভাবে আরও বেশ কিছুক্ষণ কাটল। আগুনের আভায় আকাশটাকে রাঙা হয়ে উঠতে দেখল নিমা। পাম গাছগুলোর ভেতর কমলা রঙের শিখাও মাঝে মধ্যে দেখা যাচ্ছে। কি ঘটছে বুঝতে পেরে নিজের নিরাপত্তার কথা ভুলে গেল নিমা। কিভাবে শক্তি ফিরে পেল বলতে পারবে না, লেকের পাড়ে উঠে এসে কাদায় দাঁড়িয়ে থাকল। ঠক ঠক করে কাঁপছে, ভেজা চুলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে, পানি গড়াচ্ছে চোখ দুটো থেকে। 'ভিলায় আগুন দিয়েছে ওরা!' বিড়বিড় করল নিমা। 'চাচা! ওহ্ গড, প্লীজ! নো, নো!'

ঢাল বেয়ে উঠল নিমা, জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে ছুটছে।

দুই

শেষ বাঁকটা ঘোরার আগেই হেডলাইট আর এঞ্জিন বন্ধ করে দিল আলিজান, ভিলার ঢালু ড্রাইভওয়ে ধরে গড়িয়ে এসে টেরেসের নিচে থামল ফিয়াট। পাথুরে ধাপ বেয়ে তিনজনই তারা টেরেসে উঠে এল। আলিজান যেখানে ফেলে গেছে সেখানেই পুকুরের পাশে পড়ে রয়েছেন হাসলান। সেদিকে একবারও না তাকিয়ে পাশ কাটাল তারা, সরাসরি স্টাডিরুমে ঢুকল। নাইলনের সস্তা টোট ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখল আলিজান। 'এরইমধ্যে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এবার তাড়াতাড়ি কাজ সারো।'

'দোষটা মোমিনের,' ফিয়াটের ড্রাইভার কথা বলছে, 'সে-ই তো মেয়েটাকে পালাতে দিল।'

'রাস্তায় তুমিও একটা সুযোগ পেয়েছিলে,' খেঁকিয়ে উঠল মোমিন। 'কিছু করতে পারোনি।'

'থামো!' দু'জনকেই ধমক দিল আলিজান। 'টাকা পেতে চাইলে কোন ভুল করা চলবে না।' টর্চের আলোয় টেবিলে পড়ে থাকা ক্রোলটা দেখাল সে। 'এটাই সেটা।' নিশ্চিতভাবেই জানে, চিনতে পারার জন্যে ক্রোলের ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছে তাকে। 'প্রতিটি জিনিস চেয়েছে ওরা–প্রতিটি ম্যাপ আর ফটো। কাগজ-পত্র, বই, কিছুই রেখে যাওয়া চলবে না।' দ্রুত হাতে টেবিলের সমস্ত জিনিস টোট ব্যাগে ভরে ফেলা হলো। আলিজান বলল, 'এবার ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হয়।

নিয়ে এসো তাকে।'

টেরেসে বেরিয়ে এল দু'জন, হাসলানের গোড়ালি ধরে টেনে নিয়ে এল স্টাডিতে। আনার সময় তাঁর মাথা পাথুরে ধাপের ওপর আর দোরগোড়ায় ঘন ঘন বাড়ি খেলো, তাঁর রক্ত মেঝেতে লাল ও ভেজা দাগ ফেলে দিল, টর্চের আলোয় চকচক করছে।

'ল্যাম্পটা আনো!' নির্দেশ দিল আলিজান। হাসলানের ফেলে দেয়া ল্যাম্পটা কুড়িয়ে আনল একজন। অনেক আগেই নিভে গেছে সেটা। কানের কাছে তুলে নাড়ল আলিজান। 'তেলে ভর্তি হয়ে আছে,' বলল সে, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ছিপি খুলল। 'যাও, ব্যাগটা গাড়িতে রেখে এসো।'

সবাই বেরিয়ে গেল স্টাডি থেকে, আলিজান ল্যাম্পের প্যারাফিন ঢালল হাসলানের শার্ট আর ট্রাউজারে। কাজটা শেষ করে শেলফগুলোর সামনে এসে দাঁড়াল সে, বাকি তেল দিয়ে বই আর পাণ্ডুলিপিগুলো ভেজাল। ল্যাম্প ফেলে দিয়ে আলখেল্লার ভেতর থেকে দেশলাই বের করে জ্বালল। প্রথমে বুককেসে আগুন দিল সে। দপ করে জ্বলে উঠল প্যারাফিন, স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা পাণ্ডুলিপিতে আগুন ধরে গেল। হাসলানের কাছে ফিরে এল সে। দেশলাইয়ের আরেকটা কাঠি জ্বেলে তাঁর প্যারাফিন আর রক্তে ভেজা কাপড়ে ফেলল।

হাসলানের বুকের ওপর নীল কয়েকটা শিখা নাচতে শুরু করল। কাপড় পুড়ে যাচ্ছে, আগুন ধরছে মাংসে, সেই সঙ্গে বদলে যাচ্ছে ওগুলোর রঙ। এক সময় কমলা দেখাল, মাথা থেকে ঝুল বা ভুসো ভর্তি ধোঁয়া উঠছে।

ছুটে বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ল আলিজান। চলে গেল ওরা।

অসহ্য ব্যথা জাগিয়ে দিল হাসলানকে। গভীর অতল জীবনের প্রান্তসীমা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে এরকম তীব্রতারই প্রয়োজন ছিল। গুঙিয়ে উঠলেন তিনি। জ্ঞান ফেরার পর্যায়ে প্রথমেই তিনি নিজের মাংস পোড়ার গন্ধ পেলেন, তারপরই নিদারুণ যন্ত্রণা পুরো শক্তিতে আঘাত করল তাঁকে। একটা ঝাঁকি খেয়ে কাঁপুনি শুরু হবার পর তা আর থামছে না। চোখ মেলে নিজের দিকে তাকালেন তিনি।

কালো ছাই হয়ে যাচ্ছে কাপড়, কুঁকড়ে উঠছে। আর ব্যথা যে এত তীব্র হতে পারে, তাঁর কোন ধারণা ছিল না। অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন, কামরার ভেতর তাঁর চারপাশে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া আর উত্তাপের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে, এ-সবের ভেতর দিয়ে দোরগোড়ার আকৃতিটা কোন রকমে দেখা গেল। যন্ত্রণার অবসান চাইছেন তিনি, মৃত্যু কামনা করছেন। তারপর নিমার কথা মনে পড়ল। দগ্ধ, কালো ঠোঁট খুলে ভাইঝির নামটা উচ্চারণ করতে চাইছেন, কোন আওয়াজ বেরুল না। শুধু নিমার চিন্তা নড়াচড়ার শক্তি এনে দিল তাঁকে, কারণ নিমাকে তিনি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। একটা গড়ান দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আঁচ ঝলসে দিল পিঠ। গুঙিয়ে উঠে আবার গড়ালেন, দরজার দিকে একটু এগোলেন।

নড়তে প্রবল ইচ্ছাশক্তি লাগছে, প্রতিটি নড়াচড়া নতুন করে বর্ণনাতীত যন্ত্রণা বয়ে আনছে। তবে গড়ান দিয়ে আবার যখন চিৎ হলেন, তাজা ও ঠাণ্ডা বাতাস

পাওয়ায় একটু আরাম বোধ হলো। বাড়তি শক্তিটুকু ধাপগুলোর ওপর দিয়ে ঠাণ্ডা পাকা টেরেসে নেমে আসতে সাহায্য করল তাঁকে।

কাপড় আর শরীরে এখনও আগুন জ্বলছে। নিস্তেজ ব্যাড়ি মেরে শিখাগুলো নেভাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাত দুটো জ্বলন্ত, কালো থাবা হয়ে আছে। তারপর পোনা ছাড়া পুকুরটার কথা মনে পড়ল। শরীরটাকে ঠাণ্ডা পানিতে ফেলে দেয়ার চিন্তা আরেকটু শক্তি এনে দিল মনে। ক্রল করে সেদিকে এগোলেন, শিরদাঁড়া ভাঙা সাপের মত।

মাংস থেকে উৎকটগন্ধী ধোঁয়া উঠছে, গলায় বেধে যাওয়ায় কাশি শুরু হলো, তবু মরিয়া হয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছেন। পাথুরে মেঝের খাঁজে ফোস্কা ওঠা ত্বকের কিছুটা রয়ে গেল, শেষ একটা গড়ান দিয়ে পুকুরে পড়লেন তিনি। হিস্‌স্ করে শব্দ হলো, বাষ্প উঠল খানিকটা, ম্লান মেঘ মুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিল তাঁকে। জ্বলন্ত মাংসে ঠাণ্ডা পানির আলিঙ্গন অসহনীয় ব্যথার জন্ম দিল, প্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন হাসলান।

আবার যখন সচেতন হলেন, ভেজা মাথা তুলে দেখলেন শেষ প্রান্তের ধাপ বেয়ে টেরেসে উঠে আসছে একটা ছায়ামূর্তি। কে চিনতে পারলেন না, তবে আসছে বাগানের দিক থেকে। তারপর জ্বলন্ত ভিলার আলো পড়ল ছায়ামূর্তির গায়ে, এবার নিমাকে চিনতে পারলেন তিনি। ভেজা চুল লেপ্টে আছে মুখে, ছেঁড়া ও কাদামাখা কামিজ থেকে লেকের পানি ঝরছে। ডান হাতের ওপর দিকে ব্যান্ডেজ, এখনও সামান্য রক্ত চোয়াচ্ছে।

নিমা তাঁকে দেখতে পায়নি। টেরেসের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত স্টাডিরুমের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। চাচা কি ওই আগুনের ভেতর? প্রশ্নটা মনে জাগতেই সামনে বাড়ল নিমা, কিন্তু আগুনের আঁচ নিরেট পাঁচিলের মত, ঠেকিয়ে দিল ওকে। সেই মুহূর্তে খসে পড়ল ছাদ, গর্জে উঠে আকাশের দিকে লাফ দিল শিখাগুলো, চারদিকে টুকরো টুকরো আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পিছিয়ে এল নিমা, হাত তুলে মুখ ঢাকল।

মুখ খুলে নিমাকে ডাকছেন হাসলান, কিন্তু ধোঁয়ায় পোড়া গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না। ঘুরে ছুটল নিমা, ধাপ বেয়ে নেমে যাচ্ছে। হাসলান বুঝতে পারলেন, লোকজনকে ডাকতে যাচ্ছে নিমা। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে শেষ একবার চেষ্টা করলেন তিনি, কাকের মত কর্কশ কা-কা আওয়াজ বেরুল গলা থেকে।

বন করে ঘুরে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল নিমা। চিৎকারটা শুরু হলো কয়েক সেকেন্ড পর। হাসলানের ঘাড়ের ওপর ওটা কোন মানুষের মাথা নয়। খুলির চুল অদৃশ্য হয়েছে, পুড়ে ছাই হবার পর বেশিরভাগই খসে পড়েছে; সেদ্ধ মাংসের ফালি ঝুলছে গাল আর চিবুক থেকে। গোটা মুখ কালো, ভেতরে কাঁচা মাংস দেখা যাচ্ছে। পিছু হটছে নিমা, হাসলান যেন কুৎসিত একটা প্রাণী।

'নিমা,' আওয়াজটা এত কর্কশ, কোন রকমে চেনা গেল। আবেদনের ভঙ্গিতে একটা হাত তুললেন তিনি। থামল নিমা, আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে ছুটে এসে বাড়ানো হাতটা ধরল।

'ওহ্, গড! ওহ্, গড!' ফোঁপাচ্ছে নিমা। টেনে চাচাকে পুকুর থেকে তোলার চেষ্টা করল, কিন্তু তাঁর হাতের চামড়া চলে এল ওর মুঠোর ভেতর, সার্জিকাল রাবার গ্লাভের মত। চামড়া ছাড়ানো নগ্ন ও রক্তাক্ত তালু বীভৎস দেখাচ্ছে।

পুকুরের কিনারায় হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হলো নিমা, চাচাকে দু'হাতের ভেতর তুলে নিতে চাইছে। ও জানে, চাচার ভারী শরীরটা তুলতে পারবে না। সে চেষ্টা করলে আরও বেশি ব্যথাও পাবেন হাসলান। এখন শুধু জড়িয়ে ধরে আরাম দেয়ার চেষ্টা করতে পারে ও। সন্দেহ নেই মারা যাচ্ছেন উনি, এভাবে পুড়ে যাবার পর কোন মানুষ বাঁচতে পারে না।

'লোকজন এখুনি ছুটে আসবে,' আরবীতে ফিসফিস করছে নিমা। 'নিশ্চয়ই কেউ আগুন দেখেছে। চাচা, ও চাচা, আমি তোমাকে ভালবাসি।'

নিমার আলিঙ্গনের ভেতর মোচড় খাচ্ছেন হাসলান, মরণঘাতি জখমের ব্যথায় আর কথা বলার চেষ্টায়। 'ক্রোল?' কোন রকমে শুনতে পেল নিমা। জ্বলন্ত ভিলার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ও।

'নেই,' বলল নিমা। 'সব শেষ। হয় পুড়ে গেছে, নয়তো চুরি হয়ে গেছে।'

'হাল··· ছেড়ো···না,' বললেন হাসলান, শব্দের চেয়ে ফঁপফঁপ আওয়াজের সঙ্গে বাতাসই বেশি বেরুচ্ছে গলা থেকে। 'এত পরিশ্রম··· এত সাধনা···'

'সব শেষ,' আবার বলল নিমা। 'ওগুলো ছাড়া কেউ বিশ্বাস করবে না···'

'না!' অস্পষ্ট আওয়াজ, তবে প্রতিবাদের সুরটা তীব্র। 'আমার জন্যে···আমার শেষ ইচ্ছে···'

'এ-সব বোলো না, চাচা!' মিনতি করল নিমা। 'তুমি ভাল···সুস্থ হয়ে উঠবে।'

'কথা দাও,' বললেন হাসলান। 'কথা দাও আমাকে!'

'কোন স্পনসর নেই। আমি একা। একা আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়।'

'রানা!' বললেন হাসলান। ঝুঁকে তাঁর আরও কাছে সরে এল নিমা, ওর কানে অগ্নিদগ্ধ ঠোঁট ঠেকল। 'মাসুদ রানা!' আবার বললেন তিনি। 'কঠিন মানুষ···বুদ্ধিমান মানুষ···সাহসী···' এতক্ষণে তাঁর কথা ধরতে পারল নিমা। হ্যাঁ, অবশ্যই, সম্ভাব্য স্পনসরদের তালিকায় মাসুদ রানার নামটা সবার আগে আছে। নিমা জানে, হাসলান এই মাসুদ রানাকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করেন। এই ভদ্রলোক যে তাঁর প্রথম পছন্দ, তা তিনি অনেকবার নিমাকে জানিয়েছেন। 'আমার জুনিয়র বন্ধু' বলে সম্বোধন করেন, অথচ স্নেহের পাশাপাশি শ্রদ্ধার ভাবটাও চাপা থাকে না।

'কিন্তু কি বলব তাঁকে আমি? তিনি তো আমাকে চেনেনও না। কি করে তাঁকে বিশ্বাস করাব? আসলে ক্রোলই তো নেই!'

'ওর ওপর আস্থা রাখবে,' ফিসফিস করলেন হাসলান। 'ভাল মানুষ। আস্থা রাখবে···' আবার ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ পেল তাঁর কথায়, 'আমাকে কথা দাও!'

হঠাৎ মনে পড়ল নিমার। কায়রোয়, ওদের ফ্ল্যাটে, একটা নোটবুক আছে; আরও আছে টাইটা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য ভর্তি হার্ড ড্রাইভ, ওর পি. সি.-তে। না, সব শেষ হয়ে যায়নি। 'ঠিক আছে,' রাজি হলো ও। 'কথা দিচ্ছি, চাচা।'

শরীরের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতে মানবিক কোন অনুভূতি প্রকাশ পাবার কথা নয়, তা সত্ত্বেও ফিসফিস করার সময় হাসলানের গলায় ক্ষীণ সন্তুষ্টির আভাস থাকল। 'সুখী হও··· সফল হও···' মাথাটা সামনের দিকে নত হলো, নিমার আলিঙ্গনের ভেতর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি।

গ্রামের কৃষকরা নিমাকে ওই অবস্থাতেই দেখতে পেল, পুকুরের কিনারায় চাচাকে জড়িয়ে ধরে আছে, কথা বলছে ফিসফিস করে। ইতিমধ্যে ভিলার আগুন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, আগুনের আভার চেয়ে ভোরের আলো এখন আরও বেশি উজ্জ্বল।

মিউজিয়াম আর অ্যান্টিকুইটিজ ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র সব স্টাফই শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্যে মরুদ্যানে হাজির হলেন। এমন কি আতাহার আবু কাসিম, সাংস্কৃতিক ও পর্যটন মন্ত্রীও কায়রো থেকে কালো এয়ার-কন্ডিশনড মার্সিডিজ নিয়ে চলে এলেন। মন্ত্রী হবার সূত্রে তিনিই ঘালি হাসলানের বস্।

মুসলমান, তাই চার্চের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কারিফ ফারুকী তাঁর মামার পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর মা মন্ত্রীর ছোট বোন। হাসলান প্রায়ই হাসিমুখে বলতেন, আর্কিওলজিতে ভাগ্নের সমস্ত যোগ্যতা আর অভিজ্ঞতার অভাব এই আত্মীয়তার সম্পর্ক পুষিয়ে দিয়েছে। প্রশাসক হিসেবেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। তবে সে-সব প্রকাশ্যে উচ্চারণ করতে সাহস পায় না কেউ।

চার্চের ভেতর ধূপের ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে নিমার। কালো পোশাক পরা প্রিস্ট বাইবেল পাঠ করছেন। ডান বাহুর ক্ষত শুকাতে শুরু করায় টান পড়ছে স্টিচে, নতুন করে শুরু হয়েছে জ্বালা-পোড়া। অলঙ্কৃত, গিলটি করা বেদির সামনে লম্বা কালো কফিন যতবার দেখছে নিমা, ততবার চুলবিহীন খুলি ছাড়ানো হাসলানের মাথাটা ভেসে উঠছে চোখের সামনে। টলে উঠছে ও, তাল সামলাবার জন্যে সীটের হাতল আঁকড়ে ধরতে হচ্ছে।

অবশেষে চার্চের অনুষ্ঠান শেষ হলো। তবে নিমার কাজ এখনও শেষ হয়নি। সেই একমাত্র নিকটাত্মীয়, কাজেই শব মিছিলের সামনে থাকতে হলো ওকে। পাম বীথির ভেতর দিয়ে এগোল মিছিল, শেষ মাথায় পারিবারিক গোরস্থানে হাসলানের আত্মীয়স্বজনরা অপেক্ষা করছে।

কায়রোয় ফিরে যাবার আগে আতাহার আবু কাসিম নিমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এলেন। দু'একটা সান্ত্বনার কথাও শোনালেন তিনি। 'আইন-শৃঙ্খলার কি সাংঘাতিক অবনতি! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছি। এই জঘন্য আপরাধের জন্যে দায়ী ক্রিমিন্যালদের অবশ্যই গ্রেফতার করা হবে। প্লীজ, যে-ক'দিন ইচ্ছে ছুটি নিন আপনি।'

'আমি সোমবারে মিউজিয়ামে আসছি,' জবাব দিল নিমা।

পকেট ডায়েরী বের করে পাতা ওল্টালেন মন্ত্রী, বললেন, 'তাহলে বিকেল চারটের সময় দেখা করবেন আমার সঙ্গে।' বিদায় নিয়ে মার্সিডিজের দিকে এগোলেন তিনি।

এরপর হ্যান্ডশেক করতে এলেন কারিফ ফারুকী। ফ্যাকাসে চামড়ায় অসংখ্য

তিল আর চোখের নিচে কফি রঙের দাগ থাকলেও ফারুকী যথেষ্ট লম্বা। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল, দাঁতগুলো খুব সাদা। দামী সুট আর সেন্ট ব্যবহার করেন তিনি। তাঁর বাড়ানো হাতটা দেখতে না পাবার ভান করল নিমা। গম্ভীর ও বিষণ্ন হয়ে উঠলেন ফারুকী। 'ভাল মানুষরা তাড়াতাড়ি চলে যায়,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন। 'হাসলানকে আমি শ্রদ্ধা করতাম।' মাথা ঝাঁকাল নিমা, মুখে কিছু বলল না, জানে ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন ফারুকী। হাসলান আর তাঁর ডেপুটির মধ্যে কোনকালে সদ্ভাব ছিল না। টাইটার স্ক্রোল নিয়ে কতবার কাজ করতে চেয়েছেন ফারুকী, কিন্তু হাসলান অনুমতি দেননি। বিশেষ করে লক্ষ রাখতেন, ফারুকী যাতে সপ্তম স্ক্রোল ছুঁতে না পারেন। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথা কাটাকাটিও হয়েছে কয়েকবার। 'তুমি বোধহয় ডিরেক্টর পদটার জন্যে অ্যাপ্লাই করবে, তাই না, নিমা? ওই পদ পাবার যোগ্যতা তোমার আছে।'

'ধন্যবাদ, ফারুকী, ইউ আর ভেরি কাইন্ড। ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও কিছু ভাবিনি আমি। তবে তুমিও বোধহয় অ্যাপ্লাই করছ, তাই না?'

'অবশ্যই,' নিচু গলায় হেসে উঠে মাথা ঝাঁকালেন ফারুকী। 'কে জানে, তুমি হয়তো আমার নাকের সামনে থেকে পদটা কেড়ে নেবে।' তার হাসিতে সংশয় বা উদ্বেগের লেশমাত্র নেই। আরব সমাজে নিমা একটা মেয়ে, তার ওপর ক্রিশ্চান, আর ফারুকী মন্ত্রী মহোদয়ের ভাগ্নে। তিনি জানেন পরিস্থিতিটা সম্পূর্ণই তাঁর অনুকূলে। 'বন্ধুরাও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে, আমরাও তাই করব, কি বলো? তুমি আর আমি, আমরা তো পরস্পরের বন্ধুই, তাই না?'

'হ্যাঁ, ভবিষ্যতে অনেক বন্ধু দরকার হবে আমার,' বিড়বিড় করল নিমা।

'ডিপার্টমেন্টের কে তোমার বন্ধু নয়? সবাই তোমাকে পছন্দ করে, নিমা।' ফারুকীর অন্তত এই কথাটা সত্যি। 'তোমাকে আমি লিফট দিতে পারি? আমি জানি মামা আপত্তি করবেন না।'

'আজই আমি কায়রোয় ফিরছি না, ফারুকী, তবু ধন্যবাদ। চাচার ব্যক্তিগত কিছু বিষয় দেখাশোনা করতে হবে আমাকে।' কথাটা সত্যি নয়। আজ সন্ধের দিকে কায়রোয় ওদের ফ্ল্যাটে ফিরবে নিমা। তবে কারণটা নিজেও ভাল জানে না, ফারুকীকে ওর প্ল্যান সম্পর্কে জানতে দিতে মন চাইছে না।

'তাহলে সোমবার বিকেলে মিউজিয়ামে আবার দেখা হচ্ছে।'

আত্মীয়স্বজন, পারিবারিক বন্ধু আর গ্রামের কৃষকদের সময় দিতে হলো, সবাই তারা নিমার সঙ্গে দেখা করে শোক প্রকাশ করল। নিঃসঙ্গ আর অবশ লাগছে নিজেকে, এত লোকের এত শোক আর সান্ত্বনা অর্থহীন মনে হলো নিমার। সন্ধের খানিক আগে হাসলানের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, মনটা অশান্ত হয়ে আছে। ডান হাতটা স্লিঙে ঝুলছে, গাড়ি চালাতে তেমন কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

কায়রোর কাছাকাছি এসে ট্রাফিক জামে পড়ল নিমা। গিজা-র অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে পৌছুতে রাত হয়ে গেল। চাচার রেনোয়া আন্ডার-গ্রাউন্ড গ্যারেজে রেখে এলিভেটরে চড়ে উঠে এল টপ ফ্লোরে।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দোরগোড়ায় থমকে দাঁড়াল নিমা। সিটিংরূম তছনছ করা হয়েছে–এমন কি কার্পেট গুটিয়ে ফেলা হয়েছে, দেয়াল থেকে নামানো হয়েছে সব

ক'টা পেইন্টিং। যেন একটা ঘোরের মধ্যে ভাঙাচোরা ফার্নিচার আর ছড়ানো-ছিটানো অর্নামেন্টের ভেতর দিয়ে হাঁটছে নিমা। প্যাসেজ ধরে এগোবার সময় বেডরুমের ভেতর তাকাল। বেডরুমটাও বাদ দেয়া হয়নি। ওর আর চাচার কাপড়চোপড় মেঝেতে পড়ে আছে, কাবার্ডের দরজাগুলো খোলা। একটা কাবার্ডের দরজা কজা সহ খুলে ফেলা হয়েছে। বিছানাটা ওল্টানো, চাদর আর বালিশ মেঝেতে পড়ে আছে।

একই অবস্থা বাথরুমের। কসমেটিকস আর পারফিউমের বোতল সব ক'টা ভাঙা। তবে ভেতরে ঢুকল না নিমা, জানে ঢুকলে কি দেখতে পাবে। প্যাসেজ ধরে বড় কামরাটার দিকে এগোল। ওটাই ওরা স্টাডি আর ওঅর্কশপ হিসেবে ব্যবহার করে।

এখানেও সব ভেঙেচুরে তছনছ করা হয়েছে, তবে প্রথমেই নিমার চোখ পড়ল অ্যান্টিক দাবা সেটটার ওপর। চাচার দেয়া উপহার, ওর খুব শখের জিনিস। জেট আর আইভরি দিয়ে তৈরি বোর্ডটা ভেঙে দু'টুকরো করা হয়েছে, ঘুঁটিগুলো অকারণে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে কামরার চারদিকে। ঝুঁকে সাদা কুইনটা তুলে নিল নিমা। মোচড় দিয়ে রানীর ঘাড় ভাঙা হয়েছে।

অক্ষত হাতে রানীকে নিয়ে নিমা যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। জানালার নিচে ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। সম্ভবত হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে চুরমার করা হয়েছে ওর পি. সি.। স্ক্রীন ফেটে চৌচির, মেইনফ্রেম চিঁড়ে-চ্যাপ্টা। দেখেই বোঝা যায়, হার্ড ড্রাইভে কোন তথ্য নেই। এ কমপিউটর মেরামত করা সম্ভব নয়।

দেরাজগুলো খোলা, ভেতরের সব জিনিস মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তবে ফ্লপি ডিস্কগুলো কোথাও পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল না কোন নোটবুক বা ফটোগ্রাফ। সপ্তম ফ্রোলের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তিন বছরের কঠিন পরিশ্রম আর সাধনা, সব শেষ। এখন প্রমাণ করাই অসম্ভব যে ওগুলোর অস্তিত্ব ছিল।

ডেস্কের ওপর বসে দু'হাতে মুখ ঢাকল নিমা। কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে পিঠ।

সোমবার সকালের মধ্যে নিজের জীবনে খানিকটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারল নিমা। ফ্ল্যাটে এসে ওর জবানবন্দি নিয়ে গেছে পুলিস। আবর্জনা ফেলে দিয়ে ঘরগুলো একাই যতটা সম্ভব গুছিয়ে নিয়েছে। সাদা রানীর বিচ্ছিন্ন মাথাটা খুঁজে পাবার পর আঠা দিয়ে ঘাড়ে বসিয়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে সবুজ রেনোয়ায় যখন চড়ল, ডান হাতের ক্ষতটায় প্রায় কোন ব্যথাই নেই। মনটা খুশি, তা বলা যাবে না; তবে হতাশা অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছে, নিশ্চিতভাবে জানে এখন কি করতে হবে ওকে।

মিউজিয়ামে পৌঁছে প্রথমেই হাসলানের অফিসে ঢুকল নিমা। ওর আগেই ওখানে পৌঁছে গেছেন কারিফ ফারুকী, দেখে বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করল। দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে কাজে লাগিয়েছেন ফারুকী, তারা হাসলানের ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র সব বের করে নিয়ে যাচ্ছে। ক্ষোভ চেপে রেখে নিমা শান্ত সুরে বলল,

'তোমার উচিত ছিল এই কাজটা আমাকে করতে দেয়া।'

অমায়িক হেসে ফারুকী বললেন, 'দুঃখিত, নিমা। ভাবলাম আমার সাহায্য পেলে তুমি খুশি হবে।' মোটা টার্কিশ চুরুট ফুঁকছেন। এই চুরুটের ধোঁয়া আর ঝাঁঝাল গন্ধ একদমই সহ্য করতে পারে না নিমা।

হাসলানের ডেস্কের পিছনে এসে দাঁড়াল ও, একটা দেরাজ খুলল। 'চাচার ডে বুকটা এখানে ছিল। এখন দেখছি নেই। তুমি দেখেছ?'

'না, ওই দেরাজে কিছুই পাওয়া যায়নি।' গার্ড দু'জনের দিকে তাকালেন ফারুকী, যেন সাক্ষী দিতে বলছেন। ঘাড় ও নাক চুলকে মাথা নাড়ল তারা। নিমা জানে, ডে বুকে গুরুত্বপূর্ণ খুব বেশি কিছু ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত তথ্য রেকর্ড ও জমা করার দায়িত্ব নিমার ওপর দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন হাসলান। আর নিমা সেগুলো যত্নের সঙ্গে ওর পি. সি.-তে তুলে রাখত।

'ধন্যবাদ, ফারুকী,' বলল নিমা। 'বাকি যা করার আমি করছি। তোমাকে আর আটকে রাখতে চাই না।'

'কোন সাহায্য দরকার হলে বলবে, নিমা, প্লীজ।' কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে সম্মান দেখিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেন কারিফ ফারুকী।

হাসলানের অফিস খালি করতে খুব বেশি সময় লাগল না। ব্যক্তিগত জিনিস-পত্র বেশিরভাগ আগেই বাক্সে ভরা হয়েছিল, গার্ডদের বলতে তারা সেগুলো নিমার অফিসের ভেতর দেয়াল ঘেঁষে রেখে এল। লাঞ্চ আওয়ারে নিজের কাজ নিয়ে বসল নিমা, শেষ করার পরও দেখা গেল মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে হাতে এক ঘণ্টা সময় আছে।

চাচাকে দেয়া প্রতিশ্রুতি যদি রক্ষা করতে হয়, দীর্ঘ একটা সময় মিউজিয়াম ছেড়ে দূরে থাকতে হবে নিমাকে। শ্রদ্ধেয় ফারাও আর পুরানিদর্শনগুলোর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার একটা তাগাদা অনুভব করল ও।

বিশাল বিল্ডিঙের পাবলিক সেকশনে চলে এল নিমা। সোমবার, কাজেই মিউজিয়ামের এগজিবিশন হলগুলো ট্যুরিস্টে গিজগিজ করছে। তিনতলার কয়েকটা কামরায় রয়েছে তুতেনখামেন ট্রেজার, প্রচণ্ড ভিড়ে ওখানে দু'মিনিটের বেশি টিকতে পারল না নিমা। অনেক ঠেলাঠেলি করে কোন রকমে একবার ডিসপ্লে কেবিনেটের সামনে পৌঁছতে পারল, কেবিনেটের ভেতর শিশু ফারাও-এর সোনালি ডেথ-মাস্ক রয়েছে।

ওখান থেকে বেরিয়ে প্রাচীন রাজার কাছ থেকে বিদায় নিতে এল নিমা। তিন হাজার বছর পরও দ্বিতীয় রামেসিসের সরু মুখে কোন ক্লান্তির ছাপ নেই, দেখে মনে হবে প্রশান্তচিত্তে ঘুমিয়ে আছেন তিনি। তাঁর ত্বকে হালকা চকচকে একটা ভাব আছে, মার্বেলে যেমন দেখা যায়। তাঁর চুল সোনালি, তবে হেনা বা মেহেদি দিয়ে রাঙানো। একই জিনিস দিয়ে রঙ করা হাত লম্বা, সরু এবং সুগঠিত। তবে পরনে শুধু লিনেন-এর তৈরি একটা ফালি। কবর চোররা তাঁর মমির প্যাঁচও খুলে ফেলেছিল, লিনেন ব্যান্ডেজের তলা থেকে মন্ত্রপূত কবচ আর গুবরে পোকা আকৃতির মণি পাবার লোভে, কাজেই তাঁর শরীর প্রায় নগ্নই বলা যায়। আঠারোশো একাশি সালে এল বাহারির পাহাড় প্রাচীরের একটা গুহায় অন্যান্য

রাজার মমির সঙ্গে যখন পাওয়া গেল তাঁকে, শুধু প্যাপাইরাস পার্চমেন্টের একটা টুকরো সাঁটা ছিল বুকে–ওই টুকরোটা থেকেই তাঁর বংশধারা সম্পর্কে সব কথা জানা যায়।

বংশধারা উল্লেখ করার মধ্যে এক ধরনের গৌরব তো আছেই, আরও আছে নীতিবোধ। প্রাচীন যে-কোন মমির সঙ্গে তথ্য ও বার্তা থাকে, সেগুলো কতটুকু সত্য বা অতিরঞ্জিত নয়, সেটাই হলো প্রশ্ন। এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক আলোচনা করেছে ওরা চাচা-ভাইঝি–লেখক টাইটা সত্যি কথা লিখে গেছে কি? তার বর্ণনামত সত্যিই কি বহুদূর নির্দয় আফ্রিকান পাহাড়ের গভীরে সমস্ত গুপ্তধন সহ আরেকজন মহান ফারাও নির্বিঘ্নে ঘুমিয়ে আছেন? চিন্তাটা উত্তেজিত ও রোমাঞ্চিত করে নিমাকে, গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যায়।

হাতে পনেরো মিনিট সময় থাকতে মিউজিয়ামের মূল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিমা। এক পাশের একটা হলে ঢুকবে ও, ট্যুরিস্ট বা গাইডরা ওদিকে খুব কমই যায়। গেলেও শুধু আমেনহোটেপ-এর স্ট্যাচু দেখতে।

সরু কামরাটায় ঢুকে কাচ মোড়া ডিসপ্লে কেসের সামনে দাঁড়াল নিমা, কেসটা মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত লম্বা। ছোটখাট আর্টিফ্যাক্ট, যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার, কবচ, মৃৎপাত্র ও তৈজস-পত্রে ঠাসা ভেতরটা। এগুলোর মধ্যে আছে নিউ কিংডম-এর বিশতম রাজবংশের জিনিস-পত্র, এক হাজার একশো খ্রিস্টপূর্ব আমলের। আর ওল্ড কিংডম-এর জিনিসগুলো প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। এ-সব সংগ্রহের ক্যাটালগ নিখুঁত নয়, অনেক জিনিসের কোন পরিচয়ই উল্লেখ করা হয়নি।

শেষ প্রান্তে, নিচের শেলফে, সাজানো রয়েছে অলঙ্কার, আঙটি আর সীল। প্রতিটি সীলের পাশে মোমের ওপর ওই সীলের একটা করে ছাপ। মেঝেতে হাঁটু গেড়ে এই আর্টিফ্যাক্টগুলোর একটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে নিমা। ডিসপ্লের মাঝখানে নীল ল্যাপিস ল্যাজিউলাই দিয়ে তৈরি একটা খুদে সীল। প্রাচীনকালে ল্যাপিস মূল্যবান ও দুর্লভ ছিল, যেহেতু মিশরীয় সাম্রাজ্যে জিনিসটা পাওয়া যেত না। ওই সীল থেকে মোমের ওপর যে ছাপ দেয়া হয়েছে তাতে ডানা ভাঙা একটা শ্যেন বা বাজপাখি দেখা যাচ্ছে, বাজ পাখির নিচে লেখাটা পরিষ্কার পড়তে পারল নিমা: 'টাইটা, মহারানীর লেখক'।

নিমা জানে, এ সেই একই লোক, কারণ স্ক্রোলে নিজেই সই হিসেবে ডানাভাঙা শ্যেন পাখি ব্যবহার করেছে সে। নিমা ভাবছে এই খুদে আর্টিফ্যাক্ট কোত্থেকে এখানে এল। সম্ভবত কোন গ্রামবাসী বৃদ্ধ লেখক তথা ক্রীতদাসের হারানো সমাধি থেকে চুরি করেছে। তবে কে সে, কবে বা ঠিক কোত্থেকে পেল, আজ আর তা জানার কোন উপায় নেই।

'তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ, টাইটা? এ কি মাথা খাটিয়ে তৈরি করা একটা বিরাট ধাঁধা? তুমি কি তোমার সমাধি থেকে আমার উদ্দেশে হাসছ?' আরও কাছে সরে এল নিমা, ঠাণ্ডা কাচে কপাল ঠেকে গেল। 'তোমার সমাধি যেখানেই থাকুক, তুমি যেখানেই থাকো, আমার বন্ধু হবে? নাকি আমার প্রতিপক্ষ হওয়াই তোমার ইচ্ছে?' দাঁড়িয়ে কামিজ থেকে ধুলো ঝাড়ল নিমা। 'ঠিক আছে, দেখা

যাবে। তোমার সঙ্গে খেলব আমি, দেখব কে কাকে হারাতে পারে।'

গাঢ় রঙের চকচকে সিল্ক সুট পরে ডেস্কে বসে আছেন আতাহার আবু কাসিম, তবে নিমা জানে আলখেল্লা পরেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন মন্ত্রী মহোদয়, স্বস্তি পান গালিচার ওপর কুশনে হেলান দিয়ে বসতে। ওর চোখের কৌতুক লক্ষ করে হাসলেন তিনি, বললেন, 'আজ দুপুরে কয়েকজন আমেরিকানের সঙ্গে মীটিং ছিল।'

নিমা তাঁকে পছন্দ করে। ওর সঙ্গে সব সময় ভাল ব্যবহার করেন তিনি, মিউজিয়ামে চাকরিটাও তাঁর ব্যক্তিগত অনুমোদন ছাড়া পেত না ও। তাঁর পজিশনে অন্য যে-কোন লোক মহিলা অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে নিমার আবেদন প্রত্যাখ্যান করত, বিশেষ করে স্ত্রীর আপত্তির মুখে।

ওর কুশলাদি জানতে চাইলেন তিনি। হাতের ব্যান্ডেজটা দেখিয়ে নিমা বলল, 'এক হপ্তা পর স্টিচ খোলা হবে।'

'আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সত্যি খুব খারাপ,' বলে একটা চুরুট ধরালেন আবু কাসিম। 'মৌলবাদীরাই দায়ী!'

পরিবেশ একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে, তাই ভূমিকা না করে সরাসরি নিজের কথা বলে গেল নিমা। 'চাচাকে হারিয়ে আমি এখন বুঝতে পারছি না জীবনটা নিয়ে কি করব। তাই ভাবছি দূরে কোথাও একা থাকব কিছুদিন। আমাকে ছ'মাসের ছুটি দিতে হবে। ভাবছি ইংল্যান্ডে মায়ের কাছে চলে যাব।'

মন্ত্রীর উদ্বেগ অকৃত্রিম মনে হলো। নিমাকে তিনি অনুরোধ করলেন, 'তবে প্লীজ, আমাদেরকে ছেড়ে বেশিদিন থাকবেন না। আপনাদের গবেষণা অমূল্য অবদান রেখেছে। হাসলানের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হলে আপনার সাহায্য ছাড়া চলবে না।' মুখে যাই বলুন, নিমার কথায় তিনি যে স্বস্তি পাচ্ছেন সেটা পুরোপুরি চাপা থাকল না। তিনি আশা করেছিলেন আজই তাঁর সামনে ডিরেক্টরশিপের জন্যে আবেদন-পত্র জমা দেবে নিমা। এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই ভাগ্নে কারিফ ফারুকীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তাঁর। নিমা আবেদন-পত্র জমা দিলে সান্ত্বনাসূচক কিছু বাণী শুনিয়ে অবশ্যই সেটা বাতিল করা হত। দু'জনেই ওরা জানে ডিরেক্টরের পদটা কারিফ ফারুকীই পেতে যাচ্ছেন।

বিদায় নেয়ার সময় নিমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন আবু কাসিম, ডেস্ক ঘুরে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলেন। এলিভেটরে চড়ে নিচে নামার সময় নিজেকে নিমার বন্ধনহীন ও স্বাধীন লাগল।

রেনোয়া নিয়ে গেট থেকে বেরুতেই কায়রো ট্রাফিক গ্রাস করল ওকে। অলস পিঁপড়ের মত এগোচ্ছে গাড়ি, আরোহী উপচে পড়া একটা বাস ওর সামনে, অবিরত নীল ধোঁয়া ছাড়ায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছে রেনোয়া। শহরের ট্রাফিক সমস্যার যেন কোন সমাধান নেই। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে পিছন দিকে তাকাল নিমা। ওর ব্যাক বাম্পার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে, ওটার পিছনে যানবাহনের ভিড় নিরেট ও সম্পূর্ণ অচল। শুধু মোটরসাইক্লিস্টরা চলাচলের স্বাধীনতা ভোগ করছে। সেরকম একজনকে আত্মহত্যার ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসতে দেখল নিমা। লাল তোবড়ানো একটা টু-

হানড্রেড সিসি হোন্ডা, গায়ে এত ধুলো জমেছে যে রঙটা কোন রকমে চেনা গেল। ব্যাকসীটে একজন আরোহী বসে আছে, ড্রাইভারের মত তারও মুখের নিচের অংশ মাথায় জড়ানো কাপড় নামিয়ে আড়াল করা, ধোঁয়া আর ধুলো থেকে রক্ষা পাবার জন্যে।

রঙ সাইড দিয়ে ছুটে আসছে মোটরসাইকেল, আসছে ট্যাক্সি আর ফুটপাথ ঘেঁষে পার্ক করা কারগুলার সরু ফাঁক গলে, ফাঁকটার দু'পাশে অতিরিক্ত এক ইঞ্চি জায়গাও নেই। মোটরসাইক্লিস্টের উদ্দেশ্যে অশ্লীল একটা ইঙ্গিত করল ট্যাক্সি ড্রাইভার, তারপর চিৎকার করে যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায়, তার এই পাগলামি আর বোকামির জন্যে আল্লাহ তাকে অবশ্যই নরকে পাঠাবে।

নিমার রেনোয়ার পাশে চলে এসে মুহূর্তের জন্যে মন্থর হলো হোন্ডার গতি, ব্যাক সীটে বসা আরোহী একটু ঝুঁকে খোলা দরজা দিয়ে ওর পাশের প্যাসেঞ্জার সীটের ওপর কি যেন একটা ছুঁড়ে দিল। পরক্ষণে গতি এমন বাড়ল, মুহূর্তের জন্যে রাস্তা ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল মোটরসাইকেলের সামনের চাকা। বাম দিকে সরু একটা গলি পেয়ে স্যাৎ করে ঢুকে পড়ল সেটায়, চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হবার আগে পিছনে বসা আরোহী ঘাড় ফিরিয়ে নিমার দিকে তাকাল একবার, আর ঠিক সেই সময় বাতাস লেগে সরে গেল তার মুখের কাপড়। ছ্যাঁৎ করে উঠল নিমার বুক। লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও। মরুদ্যানে একেই দেখেছিল, ফিয়াটের আলোয়। 'মোমিন!'

ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে পাশের সীটে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে তাকাল নিমা। কালচে সবুজ রঙের জিনিসটা টিভির ওঅর মুভিতে অনেকবার দেখেছে ও, রঙটা মিলিটারি গ্রীন। এটা যে একটা গ্রেনেড, বুঝতে পারল নিমা। দেখল, পিন খোলা। তারমানে এখুনি ওটা বিস্ফোরিত হবে।

কিছু চিন্তা না করেই দরজার হাতল ঘুরিয়ে লাফ দিল নিমা। খুলে হাঁ হয়ে গেল দরজা, রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল ও। ক্লাচে পা না থাকায় সচল হলো রেনোয়া, সরাসরি ধাক্কা দিল স্থির দাঁড়িয়ে থাকা বাসের পিছনে।

পিছনের ট্যাক্সিটা এগিয়ে এসেছিল, সেটার দুই চাকার আড়ালে রাস্তার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে নিমা, এই সময় বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড। ড্রাইভারের দরজা দিয়ে কমলা শিখা আর সাদাটে ধোঁয়ার মেঘ বেরিয়ে এল, সেই সঙ্গে প্রচুর আবর্জনা। পিছনের জানালা বিস্ফোরিত হলো বাইরের দিকে, হীরের কণার মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাচের টুকরো। বিস্ফোরণের শব্দে নিমার কানে তালা তো লেগেইছে, ব্যথাও করছে। বিকট আওয়াজটার পর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল, তারপরই শুরু হয়ে গেল কাতর গোঙানি আর চিৎকার-চেঁচামেচি। বসল নিমা, আহত হাতটা বুকের সঙ্গে চেপে ধরল। রেনোয়া ধ্বংস হয়ে গেছে, তবে দেখা গেল ওর স্লিং ব্যাগটা রাস্তার ওপর নাগালের মধ্যে পড়ে রয়েছে। সেটা নিয়ে কোন রকমে দাঁড়াল। চারদিকে দিশেহারা মানুষ, কে কি করবে বুঝতে পারছে না। বাসের ভেতর কয়েকজন আরোহী আহত হয়েছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ছোট্ট মেয়ের কপালে শ্র্যাপনেল লাগায় ঝর ঝর করে রক্ত ঝরছে, মেয়ের ক্ষতে রুমাল চেপে ধরেছে মা। নিমার দিকে খেয়াল নেই কারও, তবে জানা কথা এখুনি

পুলিস চলে আসবে। ও জানে, ওকে পেলে জেরা করার জন্যে আটকে রাখা হবে, হয়তো কয়েক দিনই। ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে আস্তে করে কেটে পড়ল ও, কয়েক পা এগিয়ে ঢুকে পড়ল সরু গলির ভেতর, যেটার ভেতর একটু আগে হোন্ডা মোটরবাইক অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গলিটার শেষ মাথায় পাবলিক ল্যাভেটোরি, একটা কিউবিকলে ঢুকে বন্ধ দরজায় হেলান দিল নিমা, চোখ বন্ধ করে ধাতস্থ হবার চেষ্টা করছে। চাচা হাসলানের বীভৎস হত্যাকাণ্ডের আঘাত এখনও কাটিয় উঠতে পারেনি ও, সেজন্যেই নিজের নিরাপত্তার কথা গুরুত্ব দিয়ে ভাবেনি। আজ এইমাত্র ঘটনাটা ঘটার পর ওর মনে পড়ছে, সেদিন ওকেও খুন করতে চেয়েছিল তারা। অন্ধকারে শোনা একজন আততায়ীর গলা এখনও ওর কানে বাজছে, 'মেয়েটাকে পরে কোথায় পাওয়া যাবে জেনে নিতে পারব।'

ওর প্রাণের ওপর দ্বিতীয় আঘাতটা অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয়েছে। সন্দেহ নেই, এরকম আঘাত একের পর এক আসতে থাকবে। ফ্ল্যাটে ফিরে যাওয়া উচিত হবে না, উপলব্ধি করল নিমা। কি করা উচিত আধ ঘণ্টা ধরে ভাবল। তারপর ওয়াশবেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ-হাত ধুয়ে চুল আঁচড়াল, মেকআপ ঠিকঠাক করল। রাস্তায় বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্য-হীন হেঁটে বেড়াল কিছুক্ষণ, লক্ষ রাখছে কেউ পিছু নিয়েছে কিনা। তারপর একটা ট্যাক্সি থামাল।

ব্যাংক থেকে পাঁচ হাজার মিশরীয় পাউন্ড তুলল নিমা। টাকাটা অল্পই, তবে ইয়র্কের লয়েড ব্যাংকে আরও টাকা আছে ওর। তাছাড়াও আছে মাস্টারকার্ড। এরপর সেফ ডিপোজিট থেকে একটা প্যাকেট সংগ্রহ করল, ওটায় ওর ব্রিটিশ পাসপোর্ট আর লয়েড ব্যাংকের কাগজ-পত্র আছে।

কায়রোয় নিমার পিতৃকুলের অনেক আত্মীয়স্বজন আছে, তারা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই আশ্রয় দেবে ওকে, কিন্তু নিজের বিপদের সঙ্গে তাদের কাউকে জড়াতে চাইছে না ও। ছোটখাট একটা টু-স্টার ট্যুরিস্ট হোটেল খুঁজে নিল, নদীর কাছ থেকে অনেকটা দূরে।

হোটেল রুমে নির্জনতা পেয়েই ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের রিজার্ভেশন-এ ফোন করল নিমা। কাল সকাল দশটায় হিথরোর উদ্দেশে একটা প্লেন ছাড়বে। ওয়ান-ওয়ে ইকনমি সীট বুক করল, ওদেরকে নিজের মাস্টারকার্ডের নাম্বার জানাল।

ইতিমধ্যে ছ'টা বেজে গেছে, তবে ইংল্যান্ডে এখনও অফিস-আদালত খোলা। নোটবুক খুলে নম্বরটা দেখে নিল নিমা। লীডস-ইউনিভার্সিটিতেই লেখাপড়া শেষ করেছে ও। তিনবার রিঙ হতে অপরপ্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল। 'আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট। প্রফেসর সিন কটনউড।'

সরাসরি প্রফেসরকে পেয়ে খুশি হলো নিমা। নিজের পরিচয় দিল ও।

'নিমা, সত্যি তুমি?' প্রফেসর কটনউড বিস্মিত। 'আমার ফেভারিট স্টুডেন্ট?' শুনে হাসছে নিমা। অনেক আগেই অবসর নেয়ার কথা প্রফেসরের, বয়েস সত্তরের ওপর। এখনও তিনি শক্ত-সমর্থ, অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী, আর সব সুন্দরী ছাত্রীকেই ফেভারিট বলে মনে করেন।

'ইন্টারন্যাশনাল কল, প্রফেসর,' মনে করিয়ে দিল নিমা। 'আমি শুধু জানতে চাই অফারটা এখনও বহাল আছে কিনা।'

'মাই গুডনেস, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।'

'পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে। যদি দেখা হয় সব আপনাকে খুলে বলব।'

'অবশ্যই তোমার লেকচার আমরা শুনতে চাই। কবে নাগাদ আসতে পারবে?'

'কাল আমি ইংল্যান্ডে আসছি। ইয়র্কে, মায়ের কাছে থাকব। আপনি ফোন নম্বরটা লিখে রাখুন। তবে কয়েকদিনের মধ্যে আমিই আপনাকে কল করব।'

ক্রেডলে রিসিভার রেখে দিয়ে বিছানায় কাত হলো নিমা। দু'মাস আগে রানী লসট্রিস-এর সমাধি ও স্ক্রোল আবিষ্কার এবং খনন কাজ সম্পর্কে লেকচার দেয়ার জন্যে প্রফেসর কর্টনউড আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন ওকে। গোটা বিষয়টা সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন একটা বই পড়ে–বিশেষ করে বইটার শেষে যোগ করা ফুটনোট পড়ে। বইটা প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন মহলে বিরাট আলোড়ন উঠেছিল। অ্যামেচার ও প্রফেশনাল, দু'ধরনের ঈজিপ্টলজিস্টই খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন। এমনকি টোকিও আর নাইরোবির মত দূর দেশ থেকেও প্রচুর চিঠি আর ফোন আসে। সবারই একটা প্রশ্ন, উপন্যাসের কাহিনী সত্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত কিনা।

নিমা আসলে কোন গল্প লেখককে ট্র্যান্সক্রিপসন দেখাতে একদমই রাজি হয়নি, বিশেষ করে ওগুলো তখনও সম্পূর্ণ না হওয়ায়। ওর মনে হয়েছিল, গোটা ব্যাপারটাকে সিরিয়াস অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট হিসেবে গণ্য করা উচিত। অথচ সেটাকে জনপ্রিয় বিনোদনের পর্যায়ে নামিয়ে আনা হলো। ওর আপত্তিতে এমন কি চাচা হাসলানও কান দেননি। কারণটা অবশ্যই টাকা। বড় কোন কাজ তো দূরের কথা, টাকার অভাবে ওদের ডিপার্টমেন্ট ছোটখাট কোন কাজেও হাত দিতে পারছিল না। বইটার নাম রিভার গড, লেখক উইলবার কিথ। আগেই কথা হয়ে যায়, রয়্যালটির অর্ধেক টাকা ডিপার্টমেন্ট পাবে। সেই টাকা দিয়ে এক বছর গবেষণা আর অনুসন্ধানের কাজ চালানো সম্ভব হয়েছে। তবু লেখকের প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারেনি নিমা। তার কারণ, স্ক্রোলে যা লেখা আছে তার ওপর রঙ চড়িয়েছেন তিনি, ঐতিহাসিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্বকে দিয়ে এমন সব কথা বলিয়েছেন বা এমন সব কাজ করিয়েছেন, যা করা বা বলা হয়েছে কিনা প্রমাণ নেই। প্রাচীন লেখক টাইটাকে আধুনিক লেখক উইলবার কিথ চিত্রিত করেছেন মিথ্যে বড়াইকারী ও দাম্ভিক হিসেবে, বিশেষ করে এখানেই নিমার আপত্তি।

পরে অবশ্য নিমাকে মেনে নিতে হয়েছে। একজন লেখক তাঁর পাঠককে প্রাঞ্জল ভাষায় মুখরোচক গল্পের খোরাক পরিবেশন করবেন, এ তো জানা কথা। সন্দেহ নেই, সে কাজে উইলবার কিথ পুরোপুরি সফল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলল নিমা। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে, এ নিয়ে চিন্তা করলে শুধু শুধু মাথা ব্যথাই বাড়বে।

ওর বরং এখন জরুরী সমস্যা নিয়ে চিন্তা করা দরকার। লীডস-এ লেকচার দিতে হলে ওর স্লাইডগুলো লাগবে, কিন্তু সেগুলো মিউজিয়ামে ওর অফিসে

আছে। কিভাবে ওগুলো ওখান থেকে বের করা যায় ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল নিমা, কাপড় না পাল্টেই।

শেষে সহজ সমাধানটাই বেছে নিল নিমা। অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসে ফোন করে কি করতে হবে বলে দিল ও, ওই অফিসের একজন সেক্রেটারি স্লাইডগুলো নিয়ে হাজির হলো ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চেক-ইন ডেস্কে। ওকে ওগুলো দেয়ার সময় সে জানাল, 'আজ সকালে অফিস খোলার পর পুলিস এসেছিল। কথা বলার জন্যে আপনাকে খুঁজছিল তারা।'

বোঝাই যায়, বিধ্বস্ত রেনোয়ার রেজিস্ট্রেশন চেক করেছে পুলিস। ভাগ্য ভাল যে নিমার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট আছে। মিশরীয় পাসপোর্ট নিয়ে দেশত্যাগ করতে হলে সমস্যা এড়ানো যেত না। পাসপোর্ট কন্ট্রোল পয়েন্টে পুলিস সম্ভবত রেসট্রিকশন অর্ডার দিয়ে রেখেছে। যাই হোক, চেক পয়েন্টে কোন অসুবিধে দেখা দিল না। ডিপারচার লাউঞ্জে ঢুকে নিউজ-স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল নিমা।

স্থানীয় সবগুলো দৈনিকে ওর গাড়িতে বোমা ছুঁড়ে মারার ঘটনাটা ছাপা হয়েছে, সেই সূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে ঘালি হাসলানের হত্যাকাণ্ড। রিপোর্টাররা বলতে চেয়েছে ঘটনা দুটোর মধ্যে যোগসূত্র আছে, এবং কোন দলের নাম উল্লেখ না করে মৌলবাদী ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে দায়ী বলে আভাস দেয়া হয়েছে। নিমা প্রতিটি দৈনিকেরই একটা করে কপি কিনল।

প্লেন তখন আকাশে, নোটবুক বের করে চাচা হাসলান মাসুদ রানা সম্পর্কে যা যা বলেছে সব লিখে রাখছে নিমা। লন্ডনে পৌঁছে এই ভদ্রলোককে খুঁজে বের করতে হবে, যদি তিনি ইংল্যান্ডে থাকেন।

একটা কথা কয়েকবারই ওকে বলেছেন হাসলান, 'মাসুদ রানা খোলা বই নয়। জুনিয়র হলেও সে আমার বন্ধু, অথচ আমিও তার সম্পর্কে সব কথা জানি না। তার সবটুকু পরিচয় না জানলেও চলে, বড় কথা হলো সে আমাদের কোন সাহায্যে আসবে কিনা।'

নিমা জানে, লন্ডনে ভদ্রলোকের একটা বাড়ি ও একটা ফ্ল্যাট আছে। বাংলাদেশের নাগরিক, সরকারী চাকুরে, তবে ব্রিটিশ নাগরিকত্বও আছে তাঁর। পেশা যা-ই হোক, পৃথিবীর এমন দেশ খুব কমই আছে যেখানে তিনি ভ্রমণ করেননি। খুবই সৌখিন ব্যক্তি, বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। খানিকটা অ্যাডভেঞ্চারাস টাইপের, আবার পুরানিদর্শন সংগ্রহের দিকেও বেশ কিছুটা ঝোঁক আছে। আরবী জানেন, সোয়াহিলি ছাড়াও অন্য কয়েকটা আফ্রিকান ভাষায় দখল আছে।

চাচা হাসলানের সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় হয় কয়েক বছর আগে। ঘটনাচক্রেই পরিচয়, সে-সময় দু'জনেই তাঁরা একটা বেআইনী কাজে উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। পিউনিক অর্থাৎ প্রাচীন কার্থেজ-নগরীর একাধিক ব্রোঞ্জ কাস্টিং উদ্ধার করতে হবে লিবিয়া থেকে। অভিযানে নেতৃত্ব দেন এই মাসুদ রানা।

তাঁর আরও একটা অভিযান সম্পর্কে জানতেন হাসলান। সেটাও বেআইনী কাজ। গোপনে ইসরাইলে ঢুকতে হয়েছিল। ইসরায়েলি পুলিসের নাকের ডগা

থেকে একজোড়া পাথুরে ব্যাসরিলীফ ফ্রীজ উদ্ধার করে আনেন তিনি। ফ্রীজ হলো স্তম্ভ বা কার্নিসের মধ্যবর্তী কারুকার্যময় অংশ। হাসলান জানিয়েছেন, জোড়ার একটা নাকি পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে বিক্রি করা হয়েছে, এবং পুরো টাকাটাই জমা করা হয়েছে সরকারী তহবিলে। অপরটা তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এখনও, সম্ভবত ভাল দাম না পাওয়ায় বিক্রি করেননি।

এ-সবই কয়েক বছর আগের ঘটনা। চাচার মুখে সব শোনার পর বেআইনী কাজের প্রতি রানার এই আকর্ষণ নিমাকে খানিকটা চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তবে হাসলান ওকে আশ্বস্ত করেন এই বলে, 'এমন সৎ মানুষ আজকাল হয় না। লিবিয়া আর ইসরাইয়েল ওগুলো আসলে চুরি করেছিল, তা-ও চোরেদের কাছ থেকে, রানা আসলে অন্য কাজে ওই দুই দেশে গিয়ে চোরের ওপর বাটপারি করে–এবং সেটা নিজের দেশের স্বার্থে।'

সৎ ও পবিত্র থাকার একটা ঝোঁক আছে নিজের মধ্যে, নিমা জানে। কথাটা ভেবে আপনমনে হাসল ও। মাসুদ রানা যদি ওকে সাহায্য করতে রাজি হন, সাংঘাতিক ঝুঁকি নিতে হবে তাঁকে। প্রশ্ন হলো, কোন স্বার্থ ছাড়া কেন কেউ নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নেবে? তাছাড়া, যে কাজটায় তাঁর সাহায্য চাইতে যাচ্ছে, সেটাও কোন অংশে কম বেআইনী নয়। ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি নিয়েই ঘুমিয়ে পড়ল নিমা।

এয়ার হোস্টেস ওর ঘুম ভাঙিয়ে সীট বেল্ট বাঁধার তাগিদ দিল। ওদের প্লেন হিথরোতে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে।

হাসলানের নিহত হবার খবরে নিমার মা সাবরিনা ডার্ক আঘাত পেলেন ঠিকই, তবে মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলেন আরও বেশি। নিমা তাঁকে অভয় দিয়ে বলল, 'ইংল্যান্ডে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

ইয়র্কে, মায়ের গ্রামের বাড়িতে লেকচার তৈরি করার জন্যে স্লাইড আর নোটগুলো সাজাতে কয়েকটা দিন ব্যয় করল নিমা। রোজ বিকেলে পোষা কুকুর ম্যাডকে নিয়ে গ্রামের পথে হাওয়া খেতে বেরোয় ও। মেয়ে অভয় দিলেও, একা ওকে কোথাও যেতে দেন না সাবরিনা, তিনিও সঙ্গে থাকেন। ইয়র্ক লন্ডন থেকে বেশ খানিকটা দূরে হলেও, নিমা জানে লন্ডনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন সাবরিনা, নাম করা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে খবর রাখেন। এক বিকেলে হাঁটতে বেরিয়ে মাসুদ রানার নামটা উচ্চারণ করল, জানতে চাইল, 'এই ভদ্রলোক সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?'

বিস্মিত সাবরিনা মাথা নাড়লেন। 'না তো। কেন? কে তিনি?'

প্রশ্নগুলো এড়িয়ে গেল নিমা। নিজের প্ল্যান সম্পর্কে এখুনি কিছু জানতে দিতে চায় না।

লীডস ইউনিভার্সিটিতে লেকচারটা ভালই দিল নিমা। ওর বাচনভঙ্গি চমৎকার, নিজের সাবজেক্টের ওপর ভাল দখল আছে। রানী লসট্রিসের সমাধি খোঁড়া ও স্ক্রোল আবিষ্কারের বর্ণনা মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখল শ্রোতাদের। তাদের অনেকেই বইটা পড়েছে, ফলে স্বভাবতই প্রশ্নোত্তর পর্বে জানতে চাওয়া হলো

কাহিনীর কতটুকু সত্য। এই পর্যায়ে খুব সাবধানে কথা বলতে হলো নিমাকে, লেখকের নিন্দা করা থেকে সযত্নে বিরত থাকল ও। শ্রোতারা বাছাই করা, তবে প্রফেশনালদের সঙ্গে কয়েকজন অ্যামেচারও আছে, বেশিরভাগই প্রৌঢ়। বোধহয় সেজন্যেই এক তরুণের ওপর চোখ আটকে গেল নিমার। তরুণ ব্রিটিশ নয়, ল্যাটিন আমেরিকান বা আরব বেদুইনদের সঙ্গে মিল আছে চেহারার। তবে তার নামটা নিমার জানা হলো না।

অনুষ্ঠান শেষ হবার পর সাবরিনা আর নিমাকে ডিনার খাওয়ালেন প্রফেসর কটনউড। ডিনার পরিবেশনের আগে ওয়াইন দিয়ে গেল ওয়েটার। নিমা খাবে না শুনে বিস্মিত হলেন প্রফেসর, তারপর ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'তুমি কি ধর্মান্তরিত হয়েছ? মানে মুসলমান হয়েছ?'

হেসে ফেলে নিমা বলল, 'আমি কপ্ট। তবে মদ না খাবার সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। টেস্টটা আমার ভাল লাগে না।'

'আমার লাগে,' বলে ওয়াইন ভর্তি গ্লাসটা ঠোঁটে তুললেন সাবরিনা।

'ও, ভুলেই গেছি,' হঠাৎ বললেন প্রফেসর। 'তোমার লেকচার শোনার পর এক ভদ্রলোক একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছেন। আমি বলেছি, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে। উনি তোমার চাচা হাসলানকে চিনতেন।'

'কে ভদ্রলোক?' জানতে চাইল নিমা।

'মাসুদ রানা। উনি তাঁর ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন আমাকে।'

'ওহ্ গড!' নিমাকে অস্থির দেখাল। 'আপনি আমাকে আগে বলেননি কেন? এই ভদ্রলোককেই তো খুঁজছি আমি।'

'সুদর্শন এক যুবককে তুমি দেখোনি? প্রথম সারিতেই তো বসেছিলেন।'

'প্রফেসর, প্লীজ, আপনি এখুনি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

কিন্তু ফ্ল্যাটে ফোন করে রানাকে পাওয়া গেল না। ওটা শুধু ফ্ল্যাট নয়, অফিসও বটে; ওর সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরী জানাল, বিশেষ জরুরী কাজে আজ কিছুক্ষণের মধ্যে প্যারিসে চলে যাচ্ছেন মাসুদ রানা, ফিরবেন তিন দিন পর। অগত্যা তিন দিন পরের অ্যাপয়েন্টমেন্টেই সন্তুষ্ট হতে হলো নিমাকে।

রিজেন্ট পার্কের কাছাকাছি ফ্ল্যাটটা। রোববার হলেও সেক্রেটারি স্বাতী চৌধুরীকে সন্ধের দিকে আসতে বলে দিয়েছিল রানা, ঘালি হাসলানের ভাইঝি আল নিমার আসার অপেক্ষায় বসিয়ে রেখেছে।

মেজর মাসুদ রানা একজন স্পাই, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট। ওর রক্তে অ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চের নেশা আছে, তবে শুধু এই কারণে পেশাটা বেছে নেয়নি, পবিত্র মাতৃভূমির সেবা করাটাই মূল উদ্দেশ্য। রানা একজন মুক্তিযোদ্ধাও বটে, পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজের দেশ স্বাধীন তো করেছেই, নিপীড়িত ও অধিকার বঞ্চিত বহু জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের প্রতি প্রবল ঝোঁক, তবে ঢেঁকি যেমন স্বর্গে গিয়েও ধান ভানতে ভোলে না, তেমনি রানাও

কোন অভিযানে গেলে দেশের স্বার্থের কথা সব সময় মাথায় রাখে।

ছ'টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ঘড়ির কাঁটা ধরে নিমাকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন সাবরিনা। রানার সঙ্গে কথা বলার সময় মাকে সামনে রাখতে চায় না নিমা, ঠিক হয়েছে তিনি তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন, ফেরার সময় হলে তাঁকে ফোন করবে নিমা, তিনি ওকে নিতে আসবেন।

কলিংবেল বাজতে দরজা খুলল স্বাতী চৌধুরী। নিমাকে দেখে একটু থতমত খেয়ে গেলেও, চেহারায় তা প্রকাশ পেল না। সে বলল, 'আসুন, মিস নিমা, মাসুদ ভাই আপনার জন্যে ড্রইংরূমে অপেক্ষা করছেন।' কেউ স্যার বলবে, এটা একদমই পছন্দ করে না রানা। ওর সব কর্মচারীই ওকে ভাই বলে। তেমনি রানাও কাউকে স্যার বলে সম্বোধন করতে পছন্দ করে না। ব্যতিক্রম শুধু মেজর জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) রাহাত খান, বিসিআই চীফ।

ছুটির দিন অফিস বন্ধ, তাই ফ্ল্যাটের আবাসিক অংশে নিমাকে সাক্ষাৎদান করছে রানা। সোফায় বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল ও, দরজার বাইরে থেকে স্বাতীর গলা ভেসে এল, 'মিস নিমা, মাসুদ ভাই।'

ম্যাগাজিন রেখে দিয়ে সোফা ছেড়ে দাঁড়াল রানা। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নিমা। ওকে দেখে স্বাতীর মতই মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা। অস্বাভাবিক লম্বা মেয়েটা, পাঁচ ফুট সাড়ে আট বা নয়। সালোয়ার আর কামিজ সাদা সিল্ক। বিশাল কোঁকড়ানো ক্রেপ ওড়নাটা শুধু বুক নয়, কাঁধ সহ মাথাও ঢেকে রেখেছে। ক্রিশ্চান কোন মেয়েকে এ-ধরনের পোশাকে আগে কখনও দেখেনি ও। রীতিমত পরদানশিন মনে হচ্ছে। একটু ইতস্তত করে ডান হাতটা বাড়াল ও। 'মাসুদ রানা।'

মিষ্টি হেসে নিমা বলল, 'আমি নিমা, আল নিমা–ঘালি হাসলানের ভাইঝি। দেখুন না কি কাণ্ড, আপনাকে আমি মনে মনে খুঁজছি অথচ একদম কাছ থেকে দেখেও চিনতে পারলাম না।' রানার বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল।

তাড়াতাড়ি হাতটা নামিয়ে নিল রানা। 'প্লীজ, বসুন,' ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখাল। নিমা বসার পর আবার বলল, 'আমিও আপনার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'সেদিন আপনি নিজের পরিচয় জানালে প্রাথমিক আলাপটা তখনই সেরে ফেলতে পারতাম।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ঘালি হাসলান খুন হয়েছেন, এটা আমার জন্যে খুব বড় একটা আঘাত। নিজের শোক আমি ব্যক্তিগতভাবে, একান্তে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। এই ঘটনা কেন ঘটল, কিভাবে ঘটল, এ-সবও আমার জানার ইচ্ছে।'

'চাচা আপনার কথা প্রায়ই বলতেন। তাঁর ভাষায়, আপনি তাঁর জুনিয়র বন্ধু।'

'বয়েসের পার্থক্য সত্ত্বেও তিনি আমার বন্ধুই ছিলেন,' বলল রানা। 'ভাল একজন বন্ধুকে হারিয়েছি আমি। বেশ কয়েকটা অ্যাডভেঞ্চারে তিনি আমার সঙ্গে

ছিলেন। এমন সৎ মানুষ খুব কমই দেখেছি।'

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল স্বাতী। প্লেট ভর্তি ক্রীম ক্র্যাকার আর ধূমায়িত কফির কাপ রেখে নিঃশব্দে ফিরে গেল।

নিমা বলল, 'আমি কেন আপনাকে খুঁজছিলাম সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে অনেক কথা বলতে হবে। সংক্ষেপে, হাসলান চাচার শেষ ইচ্ছে ছিল আমি আপনার কাছে আসি।'

'অন্তত আজকের দিনটা আমি ফ্রী,' বলল রানা। 'আপনি সব কথা খুলে বলুন।'

বড় করে শ্বাস নিল নিমা, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই প্রাচীন এক মিশরীয় রানী, রানী লসট্রিস-এর নাম শুনেছেন। আমি সেকেন্ড ইন্টারমিডিয়েট পিরিয়ডের কথা বলছি, হিকসস ইনভেশন-এর সময় বেঁচে ছিলেন।'

হেসে ফেলল রানা। 'ও, আপনি ওই বইটার কথা বলছেন–রিভার গড।' সোফা ছেড়ে লম্বা একটা শেলফের সামনে চলে এল ও। বইটা হাতে নিয়ে আবার ফিরে এল সোফায়, ট্রের পাশে নিচু টেবিলে রাখল ওটা। 'পড়েছি আমি।'

'পড়ে আপনার কি ধারণা হলো?' নিমার চোখে কৌতূহল।

'স্বীকার করছি, লেখক আমাকে বোকা বানিয়েছেন। পড়ার সময় বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল নিশ্চয়ই সত্য ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই লেখা হয়েছে।' হেসে উঠল রানা। 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব। এটা আমি মাস চারেক আগে পড়া শেষ করি, তারপর হাসলানকে ফোনও করেছিলাম।' বইটা তুলে নিয়ে পাতা উল্টে শেষ দিকে চলে এল ও। 'লেখকের নোট সত্যি বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে। শেষ বাক্যটা তো আমি ভুলতেই পারি না। পড়ি, কেমন? "নীলনদের উৎসমুখের কাছাকাছি অ্যাবিসিনিয়ান পাহাড়ে কোথাও ফারাও মামোস-এর অনাবিষ্কৃত ও সুরক্ষিত সমাধির ভেতর টানাস-এর মমি আছে"।'

চোখে প্রশ্ন, রানার দিকে তাকিয়ে আছে নিমা।

বইটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল রানা। 'পড়া শেষ হতে ভাবলাম, সত্যি হলে কি ভালই না হত। আসলে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেলেই নেশাটা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, যদিও জানি সময় কোথায় যে ফারাও মামোসের সমাধি খুঁজতে বেরুব! তবু হাসলানকে ফোন করি। কিন্তু তিনি যখন বললেন এ-সব স্রেফ ভিত্তিহীন অনুমান, মনটা খারাপ হয়ে যায়।'

'না, ভিত্তিহীন অনুমান নয়,' প্রতিবাদ করল নিমা, তারপর নিজেই দ্রুত সংশোধনী আনল, 'মানে, অন্তত সবটুকু নয়।'

'কিন্তু হাসলান তো মিথ্যেকথা বলার মানুষ ছিলেন না!'

'চাচা মিথ্যে কথা বলেননি, সত্যি কথাটা বলার জন্যে একটু সময় নিচ্ছিলেন। পুরো কাহিনীটা আপনাকে বলার প্রস্তুতি ছিল না তাঁর। স্বভাবতই আপনি অনেক প্রশ্ন করতেন, কিন্তু উত্তরগুলো তাঁর জানা ছিল না। তৈরি হবার পর আপনার কাছেই আসার কথা ছিল। 'পনসরদের একটা তালিকা তৈরি করি আমরা, তাতে আপনার নামটাই ছিল সবার ওপরে।'

'সব প্রশ্নের উত্তর হাসলানের জানা ছিল না, তারমানে কি আপনার জানা আছে?'

'স্ক্রোল আবিষ্কার মিথ্যে নয়। ওগুলোর নয়টা আছে কায়রো মিউজিয়ামের ভল্টে। রানী লসট্রিসের সমাধি থেকে আমিই ওগুলো আবিষ্কার করি।' লেদার শিং ব্যাগ থেকে একগাদা কালার ফটোগ্রাফ বের করল নিমা, একটা বেছে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। 'সমাধির পিছনের দেয়ালের ছবি। কুলঙ্গিতে রাখা চকচকে জারগুলো অস্পষ্ট হলেও দেখতে পাবেন। ছবিটা তোলা হয় আমরা ওগুলো নামানোর আগে।'

'ভাল ছবি, কিন্তু এটা যে-কোন জায়গায় তোলা হতে পারে।'

মন্তব্যটা কানে না তুলে রানার হাতে আরেকটা ফটো ধরিয়ে দিল নিমা। 'এটায় দশটা স্ক্রোলই দেখতে পাচ্ছেন, মিউজিয়াম ওঅর্করুমে, যেখানে বসে কাজ করতেন হাসলান চাচা। বেঞ্চের পিছনে দাঁড়ানো ভদ্রলোকদের আপনি চিনতে পারছেন?'

'হাসলান আর উইলবার কিথ।' রানার চেহারায় একাধারে সন্দেহ ও কৌতুক ফুটে উঠল। 'ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন বলুন তো!'

'এই যে, লেখক বড় ধরনের পোয়েটিক লাইসেন্স নিলেও, তিনি তাঁর বইতে যা লিখেছেন তা সত্যের ওপর ভিত্তি করে লেখা। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সপ্তম স্ক্রোলের, চাচার খুনীরা যেটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

'কেন ওটা বাকিগুলোর চেয়ে আলাদা?' খানিক পর জিজ্ঞেস করল রানা।

'এইজন্যে যে ওটায় ফারাও মামোসকে কবর দেয়ার বিবরণ দেয়া হয়েছে। এবং, আমাদের বিশ্বাস, দিক নির্দেশনাও আছে, সেটা ধরে সমাধির সাইট খুঁজে পাওয়া সম্ভব।'

'বিশ্বাস করেন, নিশ্চিতভাবে জানেন না?'

'সপ্তম স্ক্রোলের বেশিরভাগটাই এক ধরনের সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। আমি আর হাসলান চাচা যখন কোড ভাঙার কাজটা শেষ করে এনেছি, ঠিক তখনই...চাচাকে ওরা খুন করল।'

'এত দামী জিনিস, নিশ্চয়ই আরও কপি আছে?'

মাথা নাড়ল নিমা। 'সমস্ত মাইক্রোফিল্ম, আমাদের সব নোট, অরিজিনাল স্ক্রোলের সঙ্গে চুরি হয়ে গেছে। হাসলান চাচাকে যারাই খুন করে থাকুক, তারা কায়রোয় আমাদের ফ্ল্যাটে গিয়ে আমার পিসি ধ্বংস করে দিয়েছে। ওই পিসিতে আমাদের গবেষণার সমস্ত তথ্য জমা ছিল।'

টেবিলে একবার আঙুল নাচাল রানা। 'তারমানে আপনার কাছে কোন প্রমাণ নেই। এমন কিছু নেই যা দেখে বোঝা যায় কথাগুলো সত্যি?'

'না, নেই,' বলল নিমা। 'তবে এখানে সবই টুকে রাখা আছে।' চাঁপা কলার মত আঙুল দিয়ে নিজের কপালে টোকা দিল সে। 'আমার স্মরণশক্তি খুবই ভাল।'

নক করে ঘরে ঢুকল স্বাতী, কাপ-পিরিচ নিতে এসেছে। 'কফি দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে,' অবাক ভাবটা চেপে রেখে বলল সে। 'আরও দু'কাপ বানিয়ে আনি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ,' বলল রানা। স্বাতী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে নিমার দিকে

তাকাল। 'যদি খুব কষ্ট না হয়, হাসলান কিভাবে মারা গেলেন বলুন আমাকে।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। মরু গ্রামে সেই রাতে ঠিক যা ঘটেছিল সংক্ষেপে তার হুবহু বর্ণনা দিল সে। শেষ দিকে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। পকেট থেকে পরিষ্কার রুমাল বের করে তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, বলল, 'আপনি খুব সাহসী মেয়ে, নিমা। সাধারণ কোন মেয়ে হলে বাঁচত না। কিন্তু আমি ভাবছি, মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ বা পুলিস তদন্ত করে বের করতে পারল না কারা দায়ী?'

কর্তৃপক্ষ বা পুলিস কি ভূমিকা নিয়েছে তারও একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিল নিমা। মিশরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই খারাপ, অপরাধীর চেয়ে পুলিসের সংখ্যা কম। বিচার ব্যবস্থাটাই এমন যে অপরাধীরা ধরা পড়লেও পুলিস সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করতে না পারায় ছাড়া পেয়ে যায় তারা।

নিমা থামতে রানা জানতে চাইল, 'এবার বলুন, আপনি আমার কাছে কেন এসেছেন? আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

'আমার জন্যে আপনাকে কিছুই করতে হবে না। আমি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি ফারাও মামোসের সমাধিটা আপনি দেখুন।'

এ শুধু অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ নয়, রহস্য আর রোমাঞ্চে ভরপুর একটা অভিযান হাতছানি দিয়ে ডাকছে রানাকে। নেশাটা হঠাৎ যেন গ্রাস করে ফেলতে চাইল ওকে। কিন্তু না, ব্যাকুল হওয়া চলবে না। হাতে অনেক কাজ আছে। 'দেখুন, আপনার সঙ্গে এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারলে আমার চেয়ে সুখী কেউ হত না,' বলল ও। 'কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত মানুষ, জরুরী সব কাজে এমন জড়িয়ে আছি, সময় বের করা প্রায় অসম্ভব।'

কিন্তু নিমাও সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী নয়। 'আপনি সময় করতে পারবেন কি পারবেন না, সেটা পরের প্রশ্ন,' বলল সে। 'তার আগে আপনাকে আমার জানানো দরকার ঠিক কি চাই আমি। তারপর শোনা যাবে আপনি কি চান। আমি ধরে নিচ্ছি, চাচার সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, কাজেই আপনি আমাকে সাহায্য করবেন–দু'জন আমরা একসঙ্গে কাজটা করতে পারব। আর কাজটা করতে হলে কয়েকটা ব্যাপারে সমঝোতা হতে হবে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আলোচনায় রাজি হলো রানা।

শুধু কি চায় তা নয়, কি ধরনের চুক্তিতে আসতে চায় তাও ব্যাখ্যা করল নিমা। কয়েকটা বিষয়ে একমত হলো রানা, কিছু বিষয়ে তর্ক করল। এভাবে সময় গড়াল, তারপর দেখা গেল রাত বাজে একটা। ক্লান্তির কাছে নিমাই হার মানল প্রথম, বলল, 'আমি আর মাথা ঘামাতে পারছি না। ভাবছি আবার কাল সকালে শুরু করলে কেমন হয়?'

একটু ইতস্তত করে রানা বলল, 'এ-ধরনের অভিযানে বেরতে হলে হাতে প্রচুর সময় থাকতে হয়। সত্যি দুঃখিত, কাজ ফেলে আমি আসলে যেতে পারব না। লন্ডনে বসে সাহায্য করার ব্যাপার হলে কোন সমস্যা ছিল না। তাই ভাবছি, যেতেই যখন পারছি না, আলোচনা করে কি লাভ?'

'কাজটা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়,' বলল নিমা। 'বিশ্বাস করতে পারি, এমন লোকের সাহায্য নিতে হবে। তেমন কোন লোককে আমি চিনি না। হাসলান

চাচা শুধু আপনার কথা বলে গেছেন। এখন সময় করতে পারছেন না… ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করব।'

'কিন্তু কতদিন?'

'দরকার হলে ছ'মাস, কিংবা একবছর…'

'ঠিক আছে, তাহলে এক হপ্তা পর আবার আসুন আপনি,' বলল রানা। 'হয়তো মাস ছয়েকের মধ্যে সময় বার করতে পারব, তবে আলোচনাটা আমরা শেষ করে ফেলি। ঠিক আছে?'

'আমি খুশি,' বলল নিমা। 'কখন আসব বলে দিন।'

'রোববারে আসুন, এই এগারোটার দিকে।' হাতঘড়ির দিকে তাকাল রানা। 'এত রাতে ইয়র্কে ফিরবেন?' তারচেয়ে ফোন করে আপনার মাকে জিজ্ঞেস করুন এখানে আপনারা রাতটা কাটাবেন কিনা। ফ্ল্যাটে অনেকগুলো অতিরিক্ত কামরা আছে।'

'না!' লজ্জা পেল নিমা। 'আমার মা রাত করে ইয়র্কে ফিরতে অভ্যস্ত। ধন্যবাদ। ফোনটা দেবেন, প্লীজ?'

নিমাকে বিদায় দেয়ার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের নিচতলা পর্যন্ত নামল রানা। অনেক রাত হয়েছে, চায়নি মায়ের জন্যে একা অপেক্ষা করুক নিমা। অবশ্য কয়েক মিনিট পরই সবুজ ও পুরানো একটা ল্যান্ড রোভার নিয়ে হাজির হলেন সাবরিনা। বিদায় নেয়ার আগে মায়ের সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিল নিমা।

তিন

ফোনে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, পরিচিত ডাক্তারের কাছে নিমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সাবরিনা, ওর হাতের সেলাই কাটতে হবে। ব্রেকফাস্ট সেরেই নিজেদের কটেজ থেকে বেরিয়ে পড়ল মা ও মেয়ে, সঙ্গে কুকুরটাও রয়েছে। সেলাই কাটার পর নিমাকে লন্ডনে পৌঁছে দেবেন সাবরিনা। আজ রোববার, রানার সঙ্গে নিমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে এগারোটায়।

গ্রামের রাস্তায় বাঁক ঘোরার সময় নিমা বিরাট একটা ট্রাক দেখতে পেল, পোস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তবে ওটাকে নিয়ে আর কিছু ভাবল না। গ্রাম ছেড়ে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসার পর কুয়াশা দেখতে পেল ওরা, কোথাও কোথাও বেশ গাঢ়, ত্রিশ গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। সাবরিনা জোরে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, কুয়াশা থাকলেও গ্রাহ্য করছেন না। ল্যান্ড রোভার ফুল স্পীডে ছুটছে। তবে পুরানো হওয়ায় গাড়িটা সম্ভবত ঘন্টায় ষাট মাইলের বেশি ছুটতে পারে না, কৃতজ্ঞচিত্তে আন্দাজ করল নিমা।

পিছনের রাস্তা চেক করার জন্যে ঘাড় ফেরাল ও। দেখতে পেল সেই ট্রাকটা ওদের পিছনে রয়েছে। নিচের দিকে কুয়াশা জমে থাকায় ট্রাকের শুধু ক্যাব দেখা

যাচ্ছে। নিমা তাকিয়ে রয়েছে, হঠাৎ পুরো ট্রাকটাই কুয়াশায় ঢাকা পড়ে গেল। ঘাড় সোজা করে মায়ের কথায় মন দিল নিমা।

'তুমি কি সত্যি একটা লেবার গভর্নমেন্ট চাও?' মাথা নাড়ল ও।

'আমি চাই থেচার ফিরে আসুক, কারণ থেচারের সময় পেনশন নিয়ে কোন ঝামেলা হয়নি,' বললেন সাবরিনা। ফরেন সার্ভিসের পেনশনই তাঁর একমাত্র আয়।

সীটে একটু সরে বসে নোংরা পিছনের জানালা দিয়ে আবার তাকাল নিমা। ট্রাকটা এখনও ওদের পিছনে কুয়াশার মধ্যে ভেসে রয়েছে। আগের চেয়ে অনেক কাছাকাছি চলে আসায় এখন ল্যান্ড রোভারের নীলচে ধোঁয়াও খেতে হচ্ছে ড্রাইভারকে। হঠাৎ সেটার গতি আরও বাড়ল। 'মামি, ট্রাকটা বোধহয় তোমাকে পাশ কাটাতে চাইছে,' মৃদু গলায় বলল ও।

ওদের রিয়্যার বাম্পার থেকে ট্রাকের প্রকাণ্ড বনেট মাত্র বিশ ফুট দূরে। ট্রাকের রেডিয়েটর ক্রোম লোগো দিয়ে সাজানো, ক্যাপিটাল লেটারে পাশাপাশি তিনটে শব্দ–এমএএন। লোগোটা ল্যান্ড রোভারের ক্যাব-এর চেয়ে বেশি লম্বা, কাজেই নিমা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ড্রাইভারের চেহারা দেখা যাচ্ছে না।

'সবাই আমাকে পাশ কাটাতে চায়,' অভিযোগ করলেন সাবরিনা। 'সংক্ষেপে এটাই আমার জীবনকাহিনী।' জেদের বশে সরু রাস্তার মাঝখানটা দখল করে রাখলেন তিনি।

আবার পিছন দিকে তাকাল নিমা। একটু একটু করে আরও কাছে চলে আসছে ট্রাক। পিছনের জানালা পুরোপুরি ঢেকে দিল ওটা। ক্লাচ ছেড়ে দিয়ে দৈত্যাকৃতি এঞ্জিনের আবর্তন বাড়াল ড্রাইভার, ভীতিকর গর্জন শোনা গেল। 'পথ ছাড়লে ভাল করবে,' মাকে বলল নিমা। 'লোকটা মনে হচ্ছে রেগে গেছে।'

'অপেক্ষা করুক,' ঠোঁটের এক কোণ থেকে কথা বলছেন সাবরিনা, আরেক কোণে সিগারেট ঝুলছে। 'ধৈর্য একটা সদ-গুণ। তাছাড়া, এখানে ওকে পথ ছাড়া সম্ভব নয়। সামনে সরু একটা পাথুরে ব্রিজ আছে। এদিকের রাস্তা-ঘাট খুব ভাল চিনি আমি।'

ট্রাক ড্রাইভার এত কাছে থেকে ইলেকট্রিক হর্ন বাজাল, কানে তালা লেগে গেল নিমার। পিছনের সীটে লাফালাফি আর চিৎকার শুরু করল ম্যাড। 'স্টুপিড বাস্টার্ড!' তিক্ত গলায় গাল দিলেন সাবরিনা। 'উল্লুকটা ভেবেছে কি! নিমা, ওর নাম্বার প্লেট লিখে রাখো। ইয়র্ক পুলিসকে রিপোর্ট করব আমি।'

'প্লেটে কাদা, পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে না, তবে মনে হচ্ছে কন্টিনেন্টাল রেজিস্ট্রেশন। সম্ভবত জার্মান।'

যেন সাবরিনার প্রতিবাদ শুনতে পেয়েই ট্রাকের গতি সামান্য কমাল ড্রাইভার, ধীরে ধীরে দুই গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব বিশ গজে দাঁড়াল। ঘাড় ফিরিয়ে এখনও পিছন দিকে তাকিয়ে আছে নিমা।

'হুঁ-হুঁ, হুন ব্যাটা ভদ্রতা শিখছে,' সন্তুষ্টচিত্তে বললেন সাবরিনা। কুয়াশার ভেতর দিয়ে সামনে তাকালেন তিনি। 'ওই দেখা যায় ব্রিজ…'

এই প্রথম ট্রাকের ক্যাব দেখতে পাচ্ছে নিমা। ড্রাইভার এমন একটা হেলমেট পরে আছে, চোখ আর নাকের ফুটো ছাড়া মুখের সবটুকুই নীল উলে ঢাকা। হেলমেটটা তার চেহারায় অশুভ আর শয়তানি একটা ভাব এনে দিয়েছে। 'সাবধান! সর্বনাশ!' অকস্মাৎ চিৎকার শুরু করল নিমা। 'ট্রাক সোজা আমাদের ওপর উঠে আসছে!' এঞ্জিনের আওয়াজ বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে দাঁড়াল, ওদেরকে যেন ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগরের গর্জন গ্রাস করে ফেলেছে। চকচকে ইস্পাত ছাড়া এক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না নিমা। তারপরই ট্রাকের সামনের অংশ ল্যান্ড রোভারের পিছনটা চুরমার করে দিল।

ধাক্কা খেয়ে সীটের পিঠে নিমার অর্ধেক শরীর উঠে এল। কোন রকমে তাল সামলে সিধে হলো ও, দেখল ট্রাকটা ওদেরকে শিয়ালের চোয়ালে আটকানো পাখির মত তুলে নিয়েছে। চকচকে ক্রোম রেডিয়েটর স্টীল বুল বার দিয়ে সুরক্ষিত, বারগুলো প্রায় তুলে নিয়েছে ল্যান্ড রোভারকে, ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে সামনে।

হুইলের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন সাবরিনা, নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন। 'পারছি না! ব্রিজ··· সরে যেতে চেষ্টা করো···'

সেফটি-বেল্টের কুইক রিলিজ বাকলে টান দিয়ে ডোর হ্যান্ডেলের দিকে হাত বাড়াল নিমা। ব্রিজের পাথুরে পাঁচিল তীর বেগে ছুটে আসছে ওদের দিকে। রাস্তার ওপর আড়াআড়ি হয়ে যাচ্ছে ল্যান্ড রোভার, পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

নিমার হাতের ধাক্কায় কিছুটা খুলে গেল দরজা, কিন্তু পুরোটা খুলল না, কারণ ব্রিজ শুরু হবার আগে পাহারাদারের মত দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের দু'সারি স্তম্ভের মাঝখানে পৌঁছে গেছে ল্যান্ড রোভার।

গাড়ি চ্যাপ্টা হতে শুরু করায় মা ও মেয়ে একযোগে চিৎকার দিচ্ছে, ধাক্কা খেয়ে দু'জনেই ছিটকে পড়ল সামনের দিকে। পাথরের স্তম্ভে বাড়ি খেয়ে চুরমার হয়ে গেল উইন্ডস্ক্রীন, ল্যান্ড রোভারের বডি এমব্যাঙ্কমেন্ট ধরে নেমে যাবার সময় ডিগবাজি খেতে শুরু করল।

একটা গড়ান দিয়ে খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বাইরে পড়ল নিমা। ঢালের মধ্যে পড়ায় শরীরটা স্থির থাকল না, তা থাকলে হাড়গোড় সব গুঁড়ো হয়ে যেত। পড়ার পর গড়াতে শুরু করল, কিনারা থেকে খসে পড়ল ব্রিজের নিচে ঠাণ্ডা হিম স্রোতের মধ্যে।

পানির নিচে মাথাটা ডুবে যাবার আগে ওপরে আকাশ আর ব্রিজ দেখতে পেল নিমা। গর্জন তুলে বিদায় নেয়ার আগে ট্রাকটাকেও দেখতে পেল। একজোড়া বিশাল কার্গো ট্রেলার টেনে নিয়ে যাচ্ছে ওটা। ট্রেলার দুটোর লম্বা বডিওঅর্ক ব্রিজের গার্ড রেলকে ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে। দুটো ট্রেলারই গাঢ় সবুজ নাইলন তারপুলিন দিয়ে মোড়া। কাছাকাছি ট্রেলারের এক পাশে কোম্পানীর লাল ট্রেডমার্ক দেখতে পেল নিমা, কিন্তু নামটা পড়ার সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই পানির নিচে তলিয়ে গেল ও।

আবার যখন পানির ওপর মাথা তুলল, দেখল ভাটির দিকে খানিকটা সরে এসেছে। তীরে উঠে এসে কাদার মধ্যে শুয়ে কাশছে নিমা। কাশির সঙ্গে প্রচুর

পানি বেরিয়ে এল, হালকা লাগল শরীরটা। কোথায় আঘাত লেগেছে পরীক্ষা করছে, এই সময় উল্টে পড়া ল্যান্ড রোভারের দিক থেকে সাবরিনার যন্ত্রণাকাতর চিৎকার ভেসে এল।

কাদা, তারপর ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটল নিমা। এমব্যাঙ্কমেন্টের গোড়ায় চিৎ হয়ে রয়েছে ল্যান্ড রোভার। বডিটা শুধু তোবড়ায়নি, ভেঙে বা ছিঁড়ে গেছে কয়েক জায়গায়। এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে, তবে ফ্রন্ট হুইল এখনও ঘুরছে। 'মামি! মামি, তুমি কোথায়?' ফুঁপিয়ে উঠল নিমা। আহত পশুর মত সাবরিনার গোঙানি থামছে না। তোবড়ানো বডি ধরে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে নিমা, গোঙানির উৎসের দিকে এগোচ্ছে, জানে না কি দেখতে হবে।

সাবরিনা ভিজে মাটিতে বসে আছেন, ল্যান্ড রোভারের গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে। পা দুটো সরাসরি সামনের দিকে সোজা করা। তবে তাঁর বাম পা হাঁটুর কাছাকাছি মোচড় খেয়ে আছে, ফলে জুতো পরা গোড়ালি বাঁকা হয়ে কাদার দিকটা নির্দেশ করছে। সন্দেহ নেই ওই পা-টা হাঁটু বা হাঁটুর খুব কাছাকাছি ভেঙে গেছে।

গোঙানোর বা বিলাপ করার সেটা কারণ নয়। সাবরিনা বসে আছেন ম্যাডকে কোলে নিয়ে। শোকে আকুল ভঙ্গিতে কুকুরটার ওপর ঝুঁকে রয়েছেন তিনি, লাশের গায়ে হাত বুলাচ্ছেন আর দোল খাচ্ছেন, বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে আহাজারি। কুকুরটার বুক ইস্পাত আর মাটির মাঝখানে পড়ে গুঁড়িয়ে গেছে। মুখের কোণ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভের ডগা, গোলাপী ওই ডগা থেকে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। নিজের স্কার্ফ দিয়ে তা মুছে ফেলছেন সাবরিনা।

পাশে বসে মায়ের কাঁধ দুটো একহাতে জড়িয়ে ধরল নিমা। মাকে আগে কখনও কাঁদতে দেখেনি ও। আদরের হাত বুলিয়ে জননীকে সান্ত্বনা দিতে চাইছে, কিন্তু সাবরিনার বিলাপধ্বনি থামছে না।

এভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে বলতে পারবে না নিমা। তবে এক সময় বাঁকা হয়ে থাকা মায়ের অবশ পা দেখে আঁতকে উঠল, সেই সঙ্গে ভাবল কাজটা শেষ করার জন্যে ট্রাক ড্রাইভার আবার ফিরে আসতে পারে। ক্রল করে ঢালের মাথায়, সেখান থেকে রাস্তার মাঝখানে চলে এল নিমা, ব্রিজে উঠে আসা প্রথম গাড়িটাকে থামাবে।

এগারোটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট, দু'ঘণ্টা পর বেলা একটার দিকে উদ্বিগ্ন রানা ইয়র্ক পুলিসকে ফোন করল। ভাগ্য ভাল যে ল্যান্ড রোভারের লাইসেন্স প্লেটটা গত রোববারে লক্ষ করেছিল। পুলিস স্টেশনের মহিলা কনস্টেবল কমপিউটর চেক করে জানাল, 'দুঃখিত, স্যার। ল্যান্ড রোভারটা আজ সকালে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ড্রাইভার ও প্যাসেঞ্জার ইয়র্ক হসপিটালে···'

হাসপাতালে পৌঁছুতে চল্লিশ মিনিট লাগল। নিমাকে পাওয়া গেল মেয়েদের সার্জিকাল ওয়ার্ডে, মায়ের বেডের পাশে বসে আছে। অ্যানেসথেটিকের প্রভাব এখনও কাটেনি, সাবরিনা সচেতন নন। রানাকে দেখে মুখ তুলে তাকাল নিমা। 'আপনি সুস্থ তো? কি ঘটল?'

'মা···মায়ের পা ভেঙে গেছে। সার্জেনকে বাধ্য হয়ে উরুতে একটা পিন

আটকাতে হয়েছে।'

'আপনি কেমন আছেন?'

'এখানে সেখানে কেটে-ছিঁড়ে গেছে। সিরিয়াস কিছু না।'

'কিভাবে ঘটল?'

'একটা ট্রাক···ঠেলে রাস্তা থেকে ফেলে দিল আমাদেরকে।' পুরো ঘটনাটা বর্ণনা করল নিমা।

'পরিষ্কার মেরে ফেলার চেষ্টা,' বলল রানা। বিচলিত হওয়া ওর স্বভাব নয়, চেহারায় কাঠিন্য ফুটে উঠল। 'পুলিসকে জানিয়েছেন?'

'আরও সকালে পুলিসকে রিপোর্ট করা হয়েছিল ট্রাকটা চুরি গেছে–ঘটনাটা ঘটার অনেক আগে। গ্রীন সুপার কাফের সামনে থেমেছিল ড্রাইভার, তখন। লোকটা জার্মান, ইংরেজি জানে না।'

'এবার নিয়ে ওরা তিনবার আপনাকে খুন করার চেষ্টা করল,' বলল রানা। 'কাজেই আপনার নিরাপত্তার দিকটা এখন আমাকে দেখতে হবে।'

হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে এসে কাউন্টির চীফ কনস্টেবলকে ফোন করল রানা। দু'বছর আগে ইংল্যান্ডে বিশেষ একটা ট্রেনিং নিতে এসে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর। হাসপাতালের পরিচালকের সঙ্গেও ওর পরিচয় আছে।

ওয়ার্ডে ফিরে এসে দেখল সাবরিনার জ্ঞান ফিরেছে। এখনও একটু আচ্ছন্ন বোধ করছেন তিনি, তবে কোন রকম কষ্ট পাচ্ছেন না। রানা যেমন আয়োজন করেছে, চাকা লাগানো বেডে শুইয়ে সাবরিনাকে প্রাইভেট ওয়ার্ডে নিয়ে আসা হলো। কয়েক মিনিট পর তিনজন পুলিস কনস্টেবল ও অর্থোপেডিক সার্জেন একই সঙ্গে ঢুকলেন কেবিনে।

'হ্যালো, রানা, এখানে তুমি কি করছ?' সার্জেন বললেন। নিমা অবাক হয়ে ভাবছে, কত মানুষই না চেনে ওকে। সাবরিনার দিকে ফিরলেন সার্জেন, বললেন, 'কেমন লাগছে এখন? কিছু না, সত্যি ভাঙেনি–শুধু ফেটে গেছে। আবার আমরা জোড়া লাগিয়ে দিয়েছি, তবে আমাদের সঙ্গে অন্তত দশ দিন থাকতে হবে আপনাকে।'

'আপনার আপত্তি আমি গ্রাহ্য করছি না,' সাবরিনা ঘুমিয়ে পড়ার পর নিমাকে রানা নিজের গাড়িতে তুলে নিয়েছে, ফিরছে নিজের ফ্ল্যাটে। 'মানলাম লন্ডনে আপনার মায়ের অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, কিন্তু সে-সব জায়গা আপনার জন্যে মোটেও নিরাপদ নয়। আপাতত আপনাকে আমার ফ্ল্যাটেই থাকতে হবে। কথা দিচ্ছি, আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

আগেই ফোন করে স্বাতীকে সতর্ক করে দিয়েছিল রানা, ফ্ল্যাটে ফিরেই নিমাকে নিয়ে খেতে বসল ও। খাওয়া শেষ হতে হাতে দুটো পীপিং ট্যাবলেট গুঁজে দিয়ে একটা বেডরুমে ঢুকিয়ে দেয়া হলো নিমাকে।

সন্ধের দিকে ঘুম ভাঙার পর নিমা দেখল ওর প্রচুর কাপড়চোপড় ও নিত্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস ওয়ারড্রোবের ওপর নিখুঁতভাবে সাজানো। সন্দেহ নেই, এগুলো ওদের কটেজ থেকে আনানো হয়েছে। সদ্য পরিচিত সুদর্শন এক পুরুষ

স্বেচ্ছায় ওর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে এতটা করবে, ভাবতে গিয়ে বিস্মিত হলো নিমা–নিজেকে চোখ রাঙালেও, শরীরটার পুলকিত হওয়া ঠেকানো গেল না।

বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল নিমা, সুযোগ পেয়ে ছয় ফুট লম্বা আয়নায় নিজের নগ্ন শরীরটা পরীক্ষা করে নিল। বাহুর ক্ষতটা এখনও ভেজা ভেজা, পুরোপুরি শুকায়নি, উরু আর পাঁজরের এক পাশে গাঢ় দাগ ফুটে আছে, কার অ্যাক্সিডেন্টের অবদান। হাঁটুর নিচেও এক ইঞ্চি লম্বা একটা সরু দাগ, চামড়া উঠে গেছে। কাপড়চোপড় পাল্টে ডাইনিং রুমে আসার পথে খেয়াল করল, একটু খোঁড়াচ্ছে।

করিডরে দেখা হলো স্বাতীর সঙ্গে। 'ঝুল-বারান্দায় কফি দেয়া হয়েছে। ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল সে। 'মাসুদ ভাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ওঁকে মনে করিয়ে দেবেন, সাড়ে সাতটায় ডিনার, প্লীজ।'

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিমা দেখল রানা পত্রিকা পড়ছে। 'হাসপাতালে একবার ফোন করা দরকার।'

মুখ তুলল রানা। 'করা হয়েছে। দু'বার। সাবরিনা ভাল আছেন। শেষ খবর, বেডে বসে তিনি তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে খোশগল্প করছেন।'

হাসল নিমা। 'তাহলে আর চিন্তার কিছু নেই। কেবিন ছেড়ে ওঁরা কেউ নড়বেন বলে মনে হয় না।'

কফি পর্ব শেষ হতে রানা বলল, 'আজকের দিনটা বিশ্রাম নিন, কথা যা হবার কাল সকালে হবে, কি বলেন?'

'না, কেন!' প্রতিবাদ করল নিমা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের মধ্যে একটা এগ্রিমেন্ট হওয়া দরকার।'

কিন্তু আলোচনা শুরু করার পর দেখা গেল মতের মিল হচ্ছে না। প্রায় এক ঘন্টা তর্ক করল দু'জন।

'লুঠের মাল বা উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট আপনি কতটুকু পাবেন, নির্ধারণ করা সত্যি কঠিন, যতক্ষণ না আমি জানছি উদ্ধার করার পিছনে আপনার অবদান কতটুকু হবে,' কফির কাপ দুটো আবার ভরার সময় বলল রানা। 'ভুলে যাবেন না, অভিযানের সমস্ত খরচ আমি দিচ্ছি, প্ল্যানটাও আমার তৈরি।'

'আপনি ধরে নিন আমার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, তা না হলে লুঠের মাল বা উদ্ধার করা আর্টিফ্যাক্ট বলে কিছু থাকবে না। শুধু একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, এগ্রিমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আর একটি কথাও আপনাকে আমি বলছি না।'

'একটু যেন কর্কশ লাগছে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

নিমার ঠোঁটে দুষ্ট হাসি ফুটল।

'আপনি যদি আমার শর্তে রাজি না হন, স্পনসরদের তালিকায় আরও তিনজনের নাম আছে,' হুমকি দিল নিমা। 'অগত্যা তাদেরকেই আমার বিশ্বাস করতে হবে।'

'ধরা যাক, আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম, কিন্তু সমান ভাগ কিভাবে সম্ভব?'

'আর্কিওলজিকাল আর্টিফ্যাক্টস থেকে প্রথমে আমি বেছে নেব,' বলল নিমা।

'পরের বার বেছে নেয়ার সুযোগ পাবেন আপনি। এভাবে চলতে থাকবে।'

'প্রথমে আমি বাছার সুযোগ নিলে অসুবিধে কি?' একদিকের ভুরু উঁচু করে জানতে চাইল রানা।

'আসুন তাহলে টস করি,' বুদ্ধি দিল নিমা, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে এক পাউন্ডের একটা কয়েন বের করল রানা।

'কল!' আঙুলের টোকায় কয়েনটা শূন্যে ছুঁড়ে দিল রানা।

নিমা চিৎকার দিল, 'হেডস!'

'ধ্যেত!' কয়েনটা আলগোছে পকেটে ভরল রানা। 'ঠিক আছে, আপনিই আগে বেছে নেবেন–আদৌ যদি আর্টিফ্যাক্ট পাওয়া যায়। আপনার শেয়ার নিয়ে কি করবেন আপনি? সরি, প্রশ্নটা অনধিকার চর্চার মত হয়ে গেল। আপনার জিনিস নিয়ে আপনি যা খুশি করুন, আমার কিছু বলার থাকবে না। ইচ্ছে করলে সব আপনি কায়রো মিউজিয়ামকে দান করতে পারেন। তো, ডিল?' নিচু টেবিলের ওপর ডান হাতটা চিৎ করে রাখল ও।

'ডিল!' রানার হাতের ওপর হাত রাখল নিমা। 'পার্টনার।'

'এবার শুরু করুন। কোন কিছু গোপন করা যাবে না। যা জানেন সব বলে ফেলুন।'

'বইটা আনুন,' বলল নিমা। রিভার গড নিয়ে ফিরে এসে রানা দেখল, টেবিল পরিষ্কার করে ফেলেছে নিমা। 'বইয়ের যে অংশটুকু হাসলান চাচা সম্পাদনা করেছিলেন, প্রথমে সেটার ওপর চোখ বুলানো যাক।' পাতা ওল্টাচ্ছে নিমা। 'এখান থেকে। এখান থেকে চাচার অস্পষ্টকরণ শুরু হয়েছে।'

'যা বলার সরল ভাষায় বলুন,' বলল রানা। 'এরইমধ্যে আমি আপনার হেঁয়ালিকরণের শিকার।'

নিমা হাসল না। 'এ পর্যন্ত গল্পটা আপনি জানেন। হিকসস বাহিনীর কাছে উন্নতমানের চ্যারিয়ট বা রথ থাকায় রানী লসট্রিস হেরে গেলেন, তিনি তাঁর লোকজন সহ ঈজিপ্ট থেকে বিতাড়িত হলেন। নীল নদ ধরে দক্ষিণে গেলেন ওঁরা, পৌঁছুলেন সাদা ও নীল নদের সঙ্গমে। অন্য ভাষায়, আজকের দিনের খার্তুমে। এ-সবই ক্রোলে পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলে যায়।'

'মনে পড়ছে। বলে যান।'

'ওঁদের রণতরীতে রানী লসট্রিসের স্বামী অষ্টম ফারাও মামোসের মমি করা লাশ ছিল। বারো বছর আগে, হিকসস বাহিনীর একটা তীর ফুসফুসে নিয়ে তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, স্বামীকে লসট্রিস কথা দিয়েছিলেন তাঁর সমাধির জন্যে তিনি একটা সুরক্ষিত জায়গা খুঁজে বের করবেন, সেখানে সমাধির ভেতর লাশের সঙ্গে তাঁর বিপুল ধন-সম্পদও থাকবে। খার্তুমে পৌঁছে রানী লসট্রিস সিদ্ধান্ত নিলেন, স্বামীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের সময় হয়েছে। তিনি তাঁর চোদ্দ বছরের ছেলে প্রিন্স মেমননকে সমাধির স্থান খুঁজে বের করতে পাঠালেন, সঙ্গে থাকল এক স্কোয়াড্রন চ্যারিয়ট। মেমননের সঙ্গে তার পরামর্শদাতা ছিল, অক্লান্ত পুরুষ ইতিহাস লেখক–টাইটা।'

'হ্যাঁ, এই অংশটুকু আমার মনে আছে। মেমনন আর টাইটা বন্দী নিগ্রো

ক্রীতদাসদের সঙ্গে আলোচনা করে, তাদের পরামর্শেই নদীর বাম বাহু ধরে এগোয়–এই বাহুটাকেই আমরা নীল নদ বলে জানি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার শুরু করল নিমা, 'পুবদিকে চলে এল ওরা, এবং বাধা পেল ভীতিকর পাহাড়ে, এত উঁচু যে নীল দুর্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত বইতে যা পড়েছেন ক্রোলের সঙ্গে মেলে, কিন্তু এখানে এসে,' খোলা বইয়ের পাতায় টোকা দিল, 'চাচার হেঁয়ালিপনা শুরু হলো। তিনি যে ফুটহিল বা পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে দাঁড়ানো পাহাড়ের বর্ণনা দিয়েছেন...'

বাধা দিল রানা, 'পড়ার সময়ই ভেবেছি, বর্ণনায় ভুল আছে। ইথিওপিয়ান হাইল্যান্ডের যে জায়গা থেকে নীল নদ বেরিয়েছে সেখানে কোন ফুটহিল বা ফুটহিলস নেই। অসংখ্য পর্বতের একটা স্তূপ হিসেবে কল্পনা করতে হবে জায়গাটাকে, শুধু পশ্চিমে খাড়া ও বন্ধুর উতরাই বা ঢল আছে। বর্ণনাটা যে-ই দিক, নীল নদের কোর্স তার জানা নেই।'

'যেন মনে হচ্ছে আপনি জানেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা, শুনে হেসে উঠল রানা।

'কম বয়েসে বোকার মত সাহস করে মানুষ, আমিও এক আধবার করেছিলাম,' বলল রানা। 'সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যে লেক টানা থেকে ভাটির দিকে সুদানের রোজিরেস ড্যাম পর্যন্ত বোট নিয়ে গিয়েছিলাম অ্যাবে গিরিখাদের তলা দিয়ে। অ্যাবে হলো নীল নদের ইথিওপিয়ান নাম।'

'কিন্তু, কেন আপনি...'

'আগে কেউ যেতে পারেনি, তাই। মেজর চেসম্যান, ব্রিটিশ কনসাল, উনিশশো বত্রিশ সালে চেষ্টা করতে গিয়ে প্রায় মারাই পড়েছিলেন। ভেবেছিলাম অভিযানটা সফল হলে একটা বই লিখব, তা থেকে এত বেশি রয়্যালিটি পাব যে সারাজীবন আর কাজ করতে হবে না, মনের ফুর্তিতে দুনিয়াটা চষে বেড়াব। অ্যাবে নদীর পুরোটা কোর্স আমি স্টাডি করেছি, শুধু ম্যাপ দেখে নয়। একটা সেসনা একশো আশি ভাড়া করি, খাদের ওপর দিয়ে উড়ে যাই, লেক টানা থেকে ড্যাম পর্যন্ত পাঁচশো মাইল। আমার তখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছর বয়েস, সাংঘাতিক ডানপিটে।'

'কি ঘটেছিল?' নিমা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে। হাসলান চাচা এ-সম্পর্কে কিছু বলে যায়নি, তবে নিমা জানে ঠিক এ-ধরনের একটা অ্যাডভেঞ্চারেই ওদেরকে বেরুতে হবে।

'সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হয়ে আমি তখন সুদানে ট্রেনিং নিতে গেছি,' বলল রানা। 'সব মিলিয়ে আটজন ছিলাম আমরা। গিরিখাদের নিচের পানিকে এক কথায় হিংস্র বলব। মাত্র দু'দিন টিকেছিলাম। দুনিয়ার বুকে নরকতুল্য যে ক'টা জায়গা আছে, ওই গিরিখাদ তার মধ্যে একটা। অ্যারিজোনার গ্র্যান্ড ক্যানিয়নের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ গভীর ও এবড়োখেবড়ো ওটা। পাঁচশো মাইলের মধ্যে বিশ মাইল পেরতে না পেরুতেই ভেঙে চুরমার করে দেয় আমাদের সব ক'টা কাইয়্যাক। সমস্ত ইকুইপমেন্ট ছেড়ে আসতে বাধ্য হই আমরা, সভ্য জগতে আবার ফেরার জন্যে খাদের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠতে হয়েছিল।'

চেহারা ম্লান হয়ে গেল, বিষণ্ন সুরে বলল আবার, 'দুই বন্ধুকে হারাই আমরা। পারভেজ নদীতে ডুবে যায়, কায়সার পাহাড় থেকে পড়ে যায়। আমরা এমন কি ওদের লাশও খুঁজে পাইনি।'

'নীল নদের ওই খাদে আর কেউ নেভিগেট করতে পেরেছে?' জিজ্ঞেস করল নিমা, দুঃখজনক স্মৃতি থেকে রানার মনটা ফেরাতে চাইছে।

'হ্যাঁ। আরও কয়েক বছর পর ফিরে যাই আমি। দ্বিতীয়বার লীডার হিসেবে নয়, অফিশিয়াল ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সেস এক্সপিডিশন-এর ফ্রেন্ডলি ফরেন মেম্বার হিসেবে। নদীটাকে বশ মানাতে আর্মি, নেভী আর এয়ারফোর্সের সাহায্য নিতে হয়েছিল।'

নিমার এই মুহূর্তের অনুভূতি সশ্রদ্ধ বিস্ময়। রানা আক্ষরিক অর্থেই অ্যাবেতে নৌকো বেয়েছে। এ যেন নিয়তিই ওর কাছে টেনে এনেছে রানাকে। হাসলান চাচা ঠিক কথাই বলে গেছেন। এই কাজের জন্যে সব দিক থেকে উপযুক্ত লোক রানা ছাড়া আর বোধহয় নেই কেউ। 'তাহলে গিরিখাদটার স্বভাব-চরিত্র ভালই জানেন আপনি। ভেরি গুড। এবার আপনাকে আমি সপ্তম স্ক্রোলে টাইটা যা বলে গেছে সে-সম্পর্কে একটা ধারণা দেব। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, স্ক্রোলের এই অংশের কিছুটা নষ্ট হয়ে গেছে, ফলে ফাঁকগুলো পূরণ করতে হয়েছে অনুমানের ওপর নির্ভর করে। আপনাকে বলতে হবে, আপনার জানার সঙ্গে বর্ণনাটুকু মেলে কিনা।'

'দেখা যাক।'

'বন্ধুর উতরাই বা ঢল সম্পর্কে আপনি যে বর্ণনা দিচ্ছেন, টাইটার বর্ণনার সঙ্গে সেটা মেলে—খাড়া একটা পাঁচিল, ওই পাঁচিল থেকেই বেরিয়ে এসেছে নদীটা। ওরা ওদের চ্যারিয়ট ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, ক্যানিয়নের খাড়া ও এবড়োখেবড়ো এলাকায় ওগুলো চলছিল না। ভারবাহী ঘোড়া নিয়ে হাঁটা শুরু করে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে খাদটা এত গভীর আর বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, কয়েকটা ঘোড়া নিচে পড়ে যায়। ওই সময় প্রাচীন একটা ট্র্যাক অনুসরণ করছিল ওরা, পাহাড়ী ছাগলের আসা-যাওয়ায় তৈরি। ঘোড়াগুলো নদীতে পড়ে গেলেও, প্রিন্স মেমননের নির্দেশে সামনে এগোতে থাকে ওরা।'

'জায়গাটা আমি কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছি। সত্যি ভীতিকর।'

'এরপর টাইটা কয়েকটা বাধার কথা লিখেছে, তার ভাষায় সেগুলো "ধাপ"। আমি ও চাচা সিদ্ধান্তে আসতে পারিনি ওগুলো আসলে কি। তবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য অনুমান, ওগুলো আসলে জলপ্রপাত।'

'অ্যাবে গিরিখাদে জলপ্রপাতের কোন অভাব নেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'এই অংশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। টাইটা বলছে, খাদের ভেতর দিয়ে বিশ দিন এগোবার পর তারা "দ্বিতীয় ধাপ"-এর সামনে পড়ল। এখানেই প্রিন্স মেমনন তার মৃত বাবার মেসেজ পায়, স্বপ্নের ভেতর—মামোস তাঁর ছেলেকে জানান, এই জায়গাতেই তাঁকে সমাহিত করা হোক। টাইটা বলছে, এরপর তারা আর এগোয়নি। আমরা যদি নিশ্চিতভাবে জানতে পারি কিসে তারা বাধা পেয়েছিল, তাহলে খাদের কতটা ভেতরে তারা ঢুকতে পেরেছিল তার একটা নিখুঁত হিসেব

বেরিয়ে আসবে।'

'ম্যাপ আর পাহাড়ের স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ দরকার,' বলল রানা। 'আরও দরকার আমার এক্সপিডিশন নোট ও ডায়েরী।' রেফারেন্স লাইব্রেরী আপ-টু-ডেট করে রাখে ও, স্যাটেলাইট ফটো পেতে অসুবিধে হবে না। নোট আর ডায়েরী আছে ঢাকায়, ফ্যাক্সের মাধ্যমে যখন তখন আনিয়ে নিতে পারবে। 'আমার শ্রদ্ধেয় এক ভদ্রলোক, সামরিক বাহিনী থেকে অবসর নেয়া মেজর জেনারেল, তিনিও ইথিওপিয়ায় শিকার করতে গিয়েছিলেন। হয়তো তাঁর নোটও আমাদের কাজে লাগবে। ডেবরা মারকসের কাছে নীল নদ পেরিয়েছিলেন তিনি।' চেয়ার ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা।

ঠোঁটে ক্ষীণ আড়ষ্ট হাসি নিয়ে নিমাও চেয়ার ছাড়ল, তারপর বলল, 'দুটো প্রশ্ন আমাকে বিরক্ত করছে। আপনার সম্পর্কে প্রায় কিছুই আমি জানি না। আপনি কি বা কে, এ-সব জানতে চাইলে অনধিকার চর্চা হয়ে যাবে?'

'না। আগেই জেনেছেন আমি আর্মিতে ছিলাম। বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের একজন অফিসার, ফরেন সার্ভিসে আছি, মিশন নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি?'

'আপনার সঙ্গে এখানে থাকছি, লোকে কি বলবে?'

'আপনি যে খানিকটা রক্ষণশীল, সেটা বুঝতে পেরে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্বাতীকেও এখানে থাকতে বলেছি, সে আপনার পাশের কামরাতেই শোবে। আর লোকে কি বলল না বলল আমি গ্রাহ্য করি না।' নিমা কিছু বলছে না দেখে হাতঘড়ি দেখল রানা। 'একটু তাড়াতাড়ি, সাড়ে সাতটায় ডিনার। রাতে লম্বা একটা ঘুম দিন, কাল সকালে আপনার অনেক কাজ।'

সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ করে নিমা বলল, 'মাকে একবার ফোন করতে হয়।'

'করা হয়েছে,' বলল রানা। 'রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তাঁর। বলেছি আপনি তাঁকে সন্ধের দিকে দেখতে যাবেন।'

'সন্ধের দিকে?' নিমা অবাক হলো। 'এত দেরি করে কেন?'

'তার আগে পর্যন্ত আপনাকে আমি ব্যস্ত রাখতে চাই। আপনার কথায় এতগুলো টাকা আর সময় খরচ করব, জানতে হবে না কিসের পিছনে ছুটছি?' একটু থেমে কাজের কথা শুরু করল রানা। 'মরুভূমিতে আপনাদের ভিলায় প্রথম হামলাটা হলো। আততায়ীরা জানত কি চায় তারা, জানত কোথায় খুঁজতে হবে। বেশ। এবার দ্বিতীয় হামলার প্রসঙ্গে আসি। কায়রোয় আপনার গাড়ির ভেতর হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হলো। সেদিন বিকেলে আপনি মন্ত্রণালয়ে যাচ্ছেন, এ খবর কে জানত? মন্ত্রী ভদ্রলোক ছাড়া?'

'ঠিক মনে নেই। সম্ভবত হাসলান চাচার সেক্রেটারিকে বলেছিলাম, আর হয়তো বলেছিলাম রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্টদের একজনকে।'

ভুরু কুঁচকে মাথা নাড়ল রানা। 'তারমানে তো মিউজিয়ামের অর্ধেক স্টাফই আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানত। ঠিক আছে, এবার বলুন কে জানত আপনি মিশর ত্যাগ করছেন? কাকে বলেছেন ইংল্যান্ডে এসে আপনি আপনার

মায়ের কটেজে উঠবেন?'

'অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের একজন ক্লার্ক আমার পাইডগুলো এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়।'

'তাকে আপনি জানিয়েছিলেন কোন্ ফ্লাইট ধরবেন?'

'কেন জানাব!'

'কাউকেই জানাননি?'

'না···হ্যাঁ, ইন্টারভিউয়ের সময় শুধু মিনিস্টারকে বলেছিলাম, ছুটি চাওয়ার সময়। কিন্তু তিনি···না, অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেও নিমার চেহারায় আতঙ্ক ফুটে উঠল।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'দুনিয়াটা বড় বিচিত্র জায়গা, নিমা। ভাল কথা, আপনিও আমাকে শুধু রানা বলে ডাকবেন। আপনি আর হাসলান সপ্তম ক্রোলের ওপর কাজ করছিলেন, এ বিষয়ে মিনিস্টার,সবই জানতেন, তাই না?'

'বিশদ জানতেন না, তবে জানতেন আমরা কি নিয়ে ব্যস্ত।'

'ঠিক আছে, পরবর্তী প্রশ্ন–চা, না কফি?' নিমার কাপে কফি ঢালল রানা, তারপর আবার শুরু করল, 'আপনি বলেছেন সম্ভাব্য স্পনসরদের একটা তালিকা ছিল। সন্দেহভাজনদের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্যে ওটা কাজে লাগতে পারে।'

'বাফেন মিউজিয়াম,' বলল নিমা, শুনে হাসল রানা।

'তালিকা থেকে বাদ দিন ওটা। কায়রোর রাস্তায় গ্রেনেড ফাটিয়ে বেড়ানো ওদের কাজ নয়। তালিকায় আর কে ছিল?'

'হেস ডুগার্ড।'

'হ্যামবুর্গ। হেভী ইন্ডাস্ট্রি। মেটাল ও অ্যালয় রিফাইনারি। বেস মিনারেল প্রোডাকশন।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তালিকার তৃতীয় লোকটা কে?'

'ফ্রেড ম্যাকমোহন,' বলল নিমা। 'টেক্সান।'

'আরেক বিলিওনেয়ার। ফোর্ট ওয়ার্থে বাস করেন। গোটা আমেরিকা জুড়ে ফাস্ট ফুডের ব্যবসা, কারখানায় দশ হাজার লোক খাটে। মেইল অর্ডার রিটেইল। কালেক্টর হিসেবে রাক্ষস বলা হয় তাঁকে। আর্কিওলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশনে অঢেল টাকা খাটান।' পেশার খাতিরেই সারা দুনিয়ার বিলিওনেয়ারদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতে হয় রানাকে। এদের মধ্যে যারা আর্টিফ্যাক্ট কালেক্টর তাদের ওপর বিশেষ নজর রাখতে হয়। সব মিলিয়ে সংখ্যায় দুই ডজনের বেশি হবে না। বিভিন্ন নিলাম অনুষ্ঠানে ঘুরে-ফিরে দেখা-সাক্ষাৎও হয়। 'দু'জনেই এঁরা চোখ বোজা ডাকাত। পছন্দ হয়ে গেলে এঁরা তাঁদের সন্তানকেও খেয়ে ফেলতে পারেন। এঁদের পথে আপনি যদি বাধা হন, কি করবেন এঁরা? বইটা ছাপা হবার পর দু'জনের কেউ হাসলানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা জানেন?'

'জানি না, করতেও পারেন।'

'ধরে নিতে হবে হাসলান কি করছিলেন ওঁরা তা জানতেন। সন্দেহের তালিকায় দু'জনই থাকছেন। এবার চলুন আমার স্টাডিতে যাই।'

রানার স্টাডিতে ঢুকে বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেলো নিমা। সন্দেহ নেই এত সব আয়োজন করতে হওয়ায় রাতে রানা ঘুমায়নি। কামরাটাকে মিলিটারি-টাইপ

হেডকোয়ার্টার বানিয়ে ফেলেছে ও। কামরার মাঝখানে বড় একটা ইজেল ও ব্ল্যাকবোর্ড দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে একটার ওপর একটা পিন দিয়ে আটকানো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ। কাছাকাছি এসে সেগুলো দেখল নিমা, তারপর অন্যান্য জিনিসের দিকে তাকাল। প্রথমেই দৃষ্টি কেড়ে নিল একটা লার্জ-স্কেল ম্যাপ, স্যাটেলাইট ফটোগুলোর মত দক্ষিণ-পশ্চিম ইথিওপিয়ার একই এরিয়া কাভার করেছে। ম্যাপের পাশেই নাম-ঠিকানা, ইকুইপমেন্ট আর রসদের তালিকা–বোঝা গেল, এগুলো রানা ওর আগের আফ্রিকান অভিযানে ব্যবহার করেছে। দূরত্বের মাপজোক ও হিসাব সহ একটা শিটও দেখল নিমা। অপর একটা শিটে ধারণা দেয়া হয়েছে সম্ভাব্য খরচের, ওটাকে বাজেট শিট বলা যেতে পারে। ব্ল্যাকবোর্ডের মাথার দিকে শিরোনাম লেখা হয়েছে–'ইথিওপিয়া–জেনারেল-ইনফরমেশন'। নিচে গায়ে গায়ে সাঁটানো টাইপ করা পাঁচটা ফুলসক্যাপ শিট। পুরো শেডিউল পড়ল না নিমা, তবে রানার প্রস্তুতির বহর দেখে মুগ্ধ হলো।

হাতে স্টিক নিয়ে বোর্ডের পাশে দাঁড়াল রানা, ইঙ্গিতে সামনের একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বলল নিমাকে। 'ক্লাসে শৃঙ্খলা থাকতে হবে।' বোর্ডে পয়েন্টারের বাড়ি মারল। 'আপনার প্রথম কাজ আমাকে বিশ্বাস করানো কয়েক হাজার বছর আগে মুছে যাওয়া টাইটার পায়ের ছাপ আবার আমরা অনুসরণ করতে পারব। আসুন সবচেয়ে আগে অ্যাবে গিরিখাদের জিয়োগ্রাফিকাল দিকগুলো বিবেচনা করি।'

পয়েন্টার দিয়ে স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফে নদীর কোর্স ব্যাখ্যা করল রানা। 'এই সেকশন ধরে নদীটা এগিয়েছে কালো আগ্নেয় শিলায় তৈরি মালভূমি ডুবিয়ে দিয়ে। পানি থেকে ওঠা পাহাড়-প্রাচীর কোথাও কোথাও একদম খাড়া, দু'দিকে চারশো থেকে পাঁচশো ফুট উঁচু। আরও কঠিন শিসট শিলার স্তর যেখানে, প্রবাহ সেখানে সুবিধে করতে পারেনি। কাজেই নদীর চলার পথে বিশাল আকারের বেশ কিছু ধাপ তৈরি হয়েছে। টাইটার "ধাপ" যে আসলে জলপ্রপাত, আপনাদের এই ধারণা সম্ভবত সত্যি।'

টেবিলের দিকে এগিয়ে এল রানা, কাগজের অনেকগুলো বান্ডিল পড়ে রয়েছে ওপরে, সেগুলোর ভেতর থেকে একটা ফটোগ্রাফ তুলে নিল। 'ব্রিটিশ আর্মড ফোর্সেস এক্সপিডিশনের সময় এই ছবিটা তুলি আমি। খাদের ভেতর জলপ্রপাতগুলো কি রকম, সে-সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারবেন।'

সাদা কালো ছবি, দু'পাশে আকাশ ছোঁয়া পাহাড়-প্রাচীর দেখা যাচ্ছে, নিচে অর্ধনগ্ন খুদে কিছু মূর্তি ও বোট, তাদের ওপর আকাশ থেকে নেমে আসছে বিপুল জলরাশি। রোমহর্ষক একটা দৃশ্য। 'আমার কোন আইডিয়া ছিল না! এরকম দেখতে!' হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল নিমা।

'জায়গাটা কি রকম দুর্গম আর নির্জন, ছবি দেখে আপনি ধারণা করতে পারবেন না,' বলল রানা। 'একজন ফটোগ্রাফারের দৃষ্টিতে, ওখানে দাঁড়াবার এমন একটা জায়গা নেই যেখান থেকে খাদ বা জলপ্রপাতের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ক্যামেরায় বন্দী করা যায়। তবে এটুকু অন্তত বুঝতে পারবেন যে উজানের দিকে পায়ে হেঁটে আসা মিশরীয় একদল অভিযাত্রীকে কিভাবে থামিয়ে দেবে ওই জলপ্রপাত।

সাধারণত জলপ্রপাতের পাশে কোন না কোন ধরনের পথ তৈরি হয়, হাতি বা অন্য কোন বন্য প্রাণী আসা-যাওয়া করায়। তবে, এ-ধরনের জলপ্রপাতকে পাশ কাটানোর মত কোন পথ বা উপায় থাকে না।'

মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'আমরা তাহলে একমত হলাম একটা জলপ্রপাতই আরও সামনে এগোতে বাধা দেয় ওদেরকে—পশ্চিম দিক থেকে যেতে দ্বিতীয় জলপ্রপাতটা।'

স্যাটেলাইট ফটোয় নদীর কোর্স পয়েন্টার দিয়ে অনুসরণ করল রানা, সেন্ট্রাল সুদানের গাঢ় গোঁজ আকৃতির রোজিরেস ড্যাম থেকে। সীমান্তের ইথিওপিয়ান দিকটায় বন্ধুর উতরাই বা ঢাল আরও উঁচু হয়েছে, মূল গিরিখাদ শুরু হয়েছে ওখান থেকেই। 'ওদিকে কোন রাস্তা বা শহর নেই, বহুদূর উজানের দিকে শুধু দুটো ব্রিজ আছে। পাঁচশো মাইলের মধ্যে কিছুই নেই, আছে শুধু নীল নদের খরস্রোত প্রবাহ আর ভয়ালদর্শন কালো ব্যাসল্ট শিলা। খাদের গভীরে প্রধান জলপ্রপাতগুলো স্যাটেলাইট ফটোয় চিহ্নিত করে রেখেছি আমি।' পয়েন্টার তুলে সেগুলো দেখাল রানা, লাল মার্কার পেন দিয়ে তৈরি বৃত্তের ভেতর প্রতিটি।

নিমা গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে ও দেখছে।

'এখানে দ্বিতীয় জলপ্রপাত, সুদানিজ বর্ডার থেকে একশো বিশ মাইল উজানে। তবে আমাদেরকে আরও অনেক ফ্যাক্টর বিবেচনায় রাখতে হবে। যেমন, টাইটা ওদিকে গেছে আজ থেকে চার হাজার বছর আগে, ইতিমধ্যে নদী তার কোর্স বদলে থাকতে পারে।'

'কিন্তু ক্যানিয়নটা চার হাজার ফুট গভীর, ওটার ভেতর থেকে নদী পালাবে কি করে?' নিমার প্রশ্নের মধ্যে প্রতিবাদের সুর। 'নীল নদ যতই বেয়াড়া হোক।'

'ঠিক, কিন্তু নদীর তলা যে বদলেছে এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়। বন্যার মরশুমে প্রবাহের বিপুলতা ও শক্তি ব্যাখ্যা করা যায়, এমন ভাষার ওপর আমার দখল নেই। সাইড ওয়ালের বিশ মিটার পর্যন্ত ফুলে ওঠে নদী, ছোটে ঘণ্টায় দশ নট গতিতে।'

'নদীর ওই ভরা মাসে আপনি দাঁড় টেনেছেন?' নিমার গলায় সন্দেহ।

'আরে না, বন্যার মরশুমে না। ওই সময় কিছুই ওখানে টিকবে না।'

ছবিটার দিকে এক মিনিট চুপচাপ তাকিয়ে থাকল ওরা, সমস্ত আক্রোশ নিয়ে ফুলে-ফেঁপে থাকা বিপুল জলরাশির আস্ফালন কল্পনা করতে গিয়ে আতঙ্ক অনুভব করছে।

তারপর রানাকে মনে করিয়ে দিল নিমা, 'দ্বিতীয় জলপ্রপাত।'

'সেটা এখানে, উপনদীগুলোর একটা যেখানে অ্যাবের মূল প্রবাহে এসে মিলিত হয়েছে। ওটার নাম ডানডেরা নদী, বারোশো ফুট অলটিচ্যুড পর্যন্ত উঠে এসেছে, চোক রেঞ্জের সানসাই পাহাড় চূড়ার নিচে, গিরিখাদের একশো মাইল উত্তরে।'

'আপনার মনে আছে, ঠিক কোন স্পটে ওটা অ্যাবের প্রবাহে মিলিত হয়েছে?'

'সে অনেক বছর আগের কথা। তাছাড়া, ওই খাদের তলায় প্রায় এক মাস ছিলাম তো, অসংখ্য দুঃস্বপ্নের মধ্যে নির্দিষ্ট একটাকে স্মরণ করা মুশকিল।

মাইলের পর মাইল একঘেয়ে পাহাড়-প্রাচীর আর দেয়ালের ঘন জঙ্গল স্মৃতিগুলোকে ঝাপসা করে দিয়েছে। প্রচণ্ড গরম আর পোকামাকড়ের অত্যাচারে আমাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। বিরতিহীন বৈঠা চালাবার কথা মনে আছে, আর কানে এখনও লেগে আছে পানির অন্তহীন গর্জন। তবে অ্যাবে আর ডানডেরার মিলিত হবার জায়গাটা দুটো কারণে মনে আছে আমার।'

'ইয়েস?' ব্যগ্র ভঙ্গিতে সামনের দিকে ঝুঁকল নিমা, কিন্তু রানা মাথা নাড়ল।

'ওখানে আমরা একজনকে হারাই। দ্বিতীয় অভিযানের একমাত্র বলি। রশি ছিঁড়ে যায়, একশো ফুট নিচে পড়ে যায় বেচারা। পাথরের একটা স্তূপের ওপর পিঠ দিয়ে পড়ে।'

'দুঃখিত। আর কি কারণ?'

'ওখানে কপটিক ক্রিশ্চান সন্ন্যাসীদের একটা মঠ আছে, পাথরের অবয়বে তৈরি, নদীর সারফেস থেকে চারশো ফুট ওপরে।'

'গিরিখাদের ওই গভীরে?' অবিশ্বাসে ভুরু কোঁচকাল নিমা। 'ওখানে তারা মঠ বানাতে গেল কেন?'

'ইথিওপিয়া সবচেয়ে পুরানো ক্রিশ্চান দেশগুলোর মধ্যে একটা। দেশটায় নয় হাজারেরও বেশি চার্চ আর মঠ আছে। দুর্গম পাহাড়ে, পৌঁছুনো যায় না, এমন মঠের সংখ্যা অনেক। ডানডেরা নদীর ওপর এই মঠটা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস-এর সমাধি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত।'

'আপনি ওই মঠে গেছেন?'

'অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যস্ত ছিলাম, যাই কি করে! মঠ বলতে নদী থেকে আমরা শুধু দেখতে পেয়েছি পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে পাথর কাটা গহ্বর, আলখেল্লা পরা সন্ন্যাসীরা সারি সারি গুহার মুখে বসে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে আমাদের আত্মহত্যা করার প্রচেষ্টা লক্ষ করছিলেন। আমাদের কেউ কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে হাতও নাড়েন, কিন্তু পাল্টা সাড়া না পেয়ে অভিমান করেন।'

'কিন্তু নদীর যে ভয়ঙ্কর ছবি দিচ্ছেন, ওই স্পটে আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

'এরই মধ্যে হতাশ?' হাসল রানা। 'দাঁড়ান, আগে ওখানকার মশককুলের সঙ্গে পরিচিত হোন। ওরা আপনাকে তুলে নেবে, উড়িয়ে নিয়ে যাবে নিজেদের আস্তানায়, তারপর সমস্ত রক্ত শুষে ছিবড়ে বানিয়ে ফেলবে।'

'ধ্যেত, সিরিয়াস হোন। সত্যি, ওখানে যাব কিভাবে?'

'সন্ন্যাসীদের খাবার যোগান দেয় গ্রামবাসীরা, ওরা বাস করে গিরিখাদের ওপর হাইল্যান্ডে। পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে বুনো ছাগলের তৈরি ট্র্যাক আছে। ওদের কাছ থেকে জেনেছি, গিরিখাদের কিনারা থেকে ওই ট্র্যাক ধরে ওখানে নামতে তিন দিন লাগে।'

'পথ চিনে আপনি নামতে পারবেন?'

'না, তবে এ বিষয়ে মাথায় কয়েকটা আইডিয়া আছে, পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে প্রথম প্রশ্ন, চার হাজার বছর পর ওখানে পৌঁছে ঠিক কি পাবার আশা করব আমরা।' রানার চোখে প্রত্যাশা। 'এবার আপনার পালা। কনভিন্স মি।' রুপোয় মাথা মোড়া পয়েন্টারটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পাশের চেয়ারটায়

বসে পড়ল ও, ভাঁজ করা-হাত বাঁধল বুকে।

'প্রথমে আপনাকে বইটার কাছে ফিরে আসতে হবে,' পয়েন্টার রেখে দিয়ে রিভার গড তুলে নিল নিমা। 'গল্পের টানাস্ চরিত্রটির কথা আপনার মনে আছে?'

'রানী লসট্রিসের অধীনে মিশরীয় আর্মির কমান্ডার ছিলেন, টাইটেল ছিল গ্রেট লায়ন অভ ঈজিপ্ট। হিক্সস তাড়া করায় লসট্রিস বাহিনীকে তিনিই নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে সরিয়ে নিয়ে যান।'

'টানাস সেই সঙ্গে রানীর গোপন প্রেমিকও ছিলেন। এবং, আপনি যদি টাইটার বক্তব্য বিশ্বাস করেন! রানীর বড় ছেলে প্রিন্স মেমননের পিতাও বটেন।'

'আরকাউন নামে এক ইথিওপিয়ান চীফকে শায়েস্তা করতে গিয়ে দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মারা যান টানাস, তাঁর মমি করা লাশ রানীর কাছে ফিরিয়ে আনে টাইটা,' গল্পের আরও খানিক অংশ স্মরণ করল রানা।

'এ থেকে আরেকটা সূত্রে চলে আসা যায়, চাচা আর আমি বহু কষ্টে উদ্ধার করেছি।'

'সপ্তম স্ক্রোল থেকে?' বুক থেকে হাত নামিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল রানা।

'না, কোন স্ক্রোল থেকে নয়, রানী লসট্রিসের সমাধিতে পাওয়া দেয়াল লিপি থেকে।' ব্যাগ থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল নিমা। 'এটা সমাধিকক্ষে পাওয়া মিউরাল-এর আংশিক ছবি, এনলার্জ করা। দেয়ালের ওই অংশ পরে ভেঙে পড়ে, হারিয়ে যায় চিরকালের জন্যে। জারগুলো তখনই পাই আমরা। চাচা ও আমার বিশ্বাস, টাইটা এই লিপি সম্মানজনক জায়গায় রেখেছিল, এবং এটার বিশেষ তাৎপর্য আছে। সম্মানজনক জায়গা বলছি এই জন্যে যে, স্ক্রোল যেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তার ঠিক ওপরেই ছিল এই লিপি।'

ছবিটা নিয়ে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করল রানা।

হায়ারাগ্লিফিক নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা, নিমা বলে যাচ্ছে, 'বইটা থেকে আপনি জেনেছেন, হেঁয়ালি করতে ভালবাসত টাইটা, শব্দ নিয়ে কৌতুক করতে বা খেলতে পছন্দ করত। বহু জায়গায় নিজের বুদ্ধির তারিফ করেছে সে। বলেছে, সেই শ্রেষ্ঠ বাও খেলোয়াড়।'

চোখ থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস সরিয়ে রানা বলল, 'হ্যাঁ। বাও সম্ভবত দাবারই প্রাচীন সংস্করণ। মিশর ও আফ্রিকার দক্ষিণ থেকে পাওয়া কিছু বোর্ডও আমি দেখেছি।'

'বাও খেলা হয় রঙিন পাথর দিয়ে, প্রতিটি পাথরের আলাদা পদমর্যাদা। সে যাই হোক, আমরা জানি ধাঁধা তৈরি করার নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে উত্তর-পুরুষকে জানাবার একটা ঝোঁক ছিল টাইটার মধ্যে। নিজেকে বুদ্ধিমান বলে দাবি করার ভঙ্গিটায় কিন্তু গর্বের ভাব নেই, বরং যেন সতর্ক করে দেয়ার চেষ্টা। তার প্রমাণ, ফারাও-এর সমাধিতে ইচ্ছে করেই অনেক সূত্র রেখে গেছে সে। শুধু স্ক্রোলে নয়, মিউরালেও। টাইটা আমাদের বলছে, সে তার প্রিয় রানীর সমাধিতে দেয়ালচিত্রগুলো নিজের হাতে এঁকেছে বা রঙ চড়িয়েছে।'

'এটা ওই সূত্রগুলোর একটা বলে আপনার ধারণা?' ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ফটোটার ওপর টোকা দিল রানা।

'পড়ুন না,' বলল নিমা। 'আমি তো বলি ক্ল্যাসিকাল হায়ারাগ্লিফিক্স–তার দুর্বোধ্য কোডের তুলনায় কঠিন নয়।'

'আমি পড়ব? আমি হায়ারাগ্লিফিকের অর্থ করতে জানি?'

'ইস, জানি না বললেই শুনব নাকি! চাচা মিথ্যে কথা বলার লোক ছিলেন না!'

থেমে থেমে অনুবাদ করছে রানা, "রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন–নীল দাতা, যে নীল তাঁকে খুন করেছে–হাপির সঙ্গে হাতে হাত ধরে অনন্ত কাল পাহারা দিচ্ছেন পাথুরে শেষ ইচ্ছাপত্র, যে ইচ্ছাপত্রে আভাস দেয়া হয়েছে রাজপুত্রের জনককে কোথায় রাখা হয়েছে, যিনি কিনা জনক নন, রক্ত এবং ছাই দাতা।" মাথা নাড়ল রানা, 'না, কোন অর্থ পাওয়া যাচ্ছে না। আমি বোধহয় অনুবাদে ভুল করছি।'

'হতাশ হবেন না। এই তো সবে টাইটার সংস্পর্শে এলেন। এটা নিয়ে আমরা কয়েক হপ্তা মাথা ঘামিয়েছি। ধাঁধাটা ধরতে হলে রিভার গডে ফিরে যেতে হবে। মানে ট্যানাস প্রিন্স মেমননের জনক নন, তবে রানীর প্রেমিক হিসেবে তার বায়োলজিক্যাল ফাদার। মৃত্যুশয্যায় তিনি মেমননকে নীল তলোয়ার উপহার দিয়েছিলেন, এই নীল তলোয়ারের আঘাতেই তিনি গুরুতর জখম হন, আরকাউনকে শায়েস্তা করতে গিয়ে, আরকাউনের দ্বারাই। বইটায় যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে।'

'হ্যাঁ, বইটা পড়ার সময় আমি ভেবেছিলাম নীল তলোয়ারটা নিশ্চয়ই ওই ব্রোঞ্জ যুগে একটা বিস্ময়কর বস্তু ছিল। কাজেই রাজপুত্রকে দেয়ার মত একটা উপহার হতেই পারে। তাহলে, "রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন" আসলে ট্যানাস?' বড় একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল রানা। 'আপাতত আপনার করা অর্থ আমি মেনে নিলাম।'

'ধন্যবাদ। ফারাও মামোস নামেমাত্র মেমননের জনক ছিলেন, রক্তসম্পর্কিত বাবা নন। এখানেও আবার বলা হচ্ছে, রাজপুত্রের জনক, যিনি কিনা জনক নন। মামোস প্রিন্সকে ঈজিপ্টের ডাবল ক্রাউন দান করে যান, আপার অ্যান্ড লোয়ার কিংডম–রক্ত ও ছাই।'

'এটুকু হজম করতে তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। বাকিটুকু?'

'এবার আসুন, হাতে হাতে ধরে। প্রাচীন মিশরীয় ভাষায় এর অর্থ হতে পারে, কাছাকাছি, অথবা দৃষ্টিসীমার ভেতর। হাপি হলেন নীল নদের উভলিঙ্গ দেবতা বা দেবী, তিনি কখন কি জেন্ডার গ্রহণ করবেন তার ওপর নির্ভর করে। স্ক্রোলের সব জায়গায় নদীটার বিকল্প নাম হিসেবে হাপিকে ব্যবহার করেছে টাইটা।'

'তাহলে সপ্তম স্ক্রোল আর রানীর সমাধিতে পাওয়া দেয়াললিপি এক করলে পুরো বক্তব্যটা কি দাঁড়াচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'সংক্ষেপে এই–দ্বিতীয় জলপ্রপাতের কাছাকাছি কোথাও অথবা দৃষ্টিসীমার ভেতর কোথাও ট্যানাসকে কবর দেয়া হয়েছে। তাঁর সমাধির বাইরে বা ভেতরে কোথাও একটা মনুমেন্ট অথবা লিপি আছে, যাতে মামোসের সমাধিতে যাবার পথনির্দেশ পাওয়া যাবে।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'লাফ দিয়ে শূন্য থেকে অর্থ লুফে

নিচ্ছি, ফলে আমি ক্লান্ত। আমার জন্যে আর কি সূত্র রেখেছেন আপনি?'

'আর কোন সূত্র নেই।'

'কি বলছেন! আর কোন সূত্র নেই মানে?' রানা হতভম্ব।

'সত্যি নেই।'

'আসুন ধরা যাক, নদীটা চার হাজার বছর পরও আকৃতি ও নকশায় একই রকম আছে। আরও ধরা যাক, টাইটা আসলেও ডানডেরা নদীর দ্বিতীয় জলপ্রপাতের' দিকটা নির্দেশ করছেন। ওখানে পৌঁছে তাহলে আমরা ঠিক কি খুঁজব? যদি শিলা-লিপি থাকে, তা কি অটুট অবস্থায় পাব? নাকি স্রোত আর রোদ-বৃষ্টির অত্যাচারে ক্ষয়ে গেছে সব?'

নিমা বলল, 'হাওয়ার্ড কার্টারের কাছেও এরকম অস্পষ্ট ও দুর্বল একটা সূত্র ছিল। মাত্র এক টুকরো প্যাপাইরাস, তা-ও সেটার অথেনটিসিটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি। অথচ ওই সূত্রই আমাদেরকে তুতানখামেনের সমাধিতে পৌঁছে দিয়েছে।'

'হাওয়ার্ড কার্টারকে শুধু ভ্যালি অভ দ্য কিংস সার্চ করতে হয়েছিল। তা সত্ত্বেও দশ বছর লেগে যায় তাঁর। আর আপনি আমাকে ইথিওপিয়া দিচ্ছেন, আকারে ফ্রান্সের দ্বিগুণ। কতদিন লাগবে আমাদের, ধারণা করতে পারেন?'

চেয়ার ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল নিমা। 'এত বাড়ান কেন? গোটা ইথিওপিয়া নয়, আপনাকে আমি শুধু একটা গিরিপথ দিচ্ছি। ভাল কথা, কবে রওনা হব ঠিক করেছেন?'

চিন্তা করছে রানা। কাল রাতেই বিসিআই হেডকোয়ার্টার ঢাকায় ছুটির দরখাস্ত পাঠিয়ে দিয়েছে ও। রাহাত খানের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপটাও সেরে ফেলেছে, আশা করা যায় আজকালের মধ্যেই মঞ্জুর করা হবে ছুটি। 'ঠিক আছে, নাসিমের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা যাক,' বলে হাত বাড়াল ফোনের দিকে।

নাসিম ওর এক বন্ধুর স্ত্রী, স্বামী মারা যাবার পর নিজেই একটা প্লেন কিনে চার্টার সার্ভিস চালাচ্ছে। ইদানীং সাইড ব্যবসা হিসেবে সাফারির আয়োজনও করে সে।

ওভাল সাফারির কায়রো অফিসে নাসিমকে পাওয়া গেল না, দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় আমস্টারডামের অফিসে পাওয়া গেল। রানার গলা চিনতে পেরেই অভিমান উথলে উঠল তার, অভিযোগ করল, 'রানা, তুমি তো দেখছি আমাদের কথা একদম ভুলেই গেছ!'

'কেমন আছ তুমি? ভুলে গেলে ফোন করতাম?'

'ভাল আছি, রানা। আশা করি তুমিও ভাল আছ। জানি কোনও কাজের কথা বলবে।'

'ঠিক ধরেছ,' বলল রানা, তারপর অনুরোধটা জানাল।

'ইথিওপিয়ায়?' জিজ্ঞেস করল নাসিম, গলার আওয়াজ একটু ম্লান শোনাল। 'কবে যেতে চাও?'

'এই ধরো আগামী হপ্তায়।'

'ঠাট্টা করছ নাকি? ওখানে আমরা মাত্র একজন হান্টার গাইডকে দিয়ে কাজ

করাই, দু'বছরের জন্যে বুক হয়ে আছে সে।'

'আর কেউ নেই? বর্ষা শুরু হবার আগেই ঢুকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাকে'।'

'শিকার কি হবে?'

'ঢাকা মিউজিয়ামের জন্যে এটা হবে আমাদের কালেকটিং ট্রিপ, অ্যাবে নদীপথে,' এরবেশি আর কিছু বলতে প্রস্তুত নয় রানা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নাসিম। 'আগেই বলে রাখছি, এতে আমাদের সায় নেই। এত অল্প সময়ের নোটিশে মাত্র একজন গাইডকে তুমি পেতে পারো, তবে আমি জানি না নীল নদে তার কোন ক্যাম্প আছে কিনা। লোকটা রাশিয়ান, তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগও শোনা গেছে। কেউ কেউ বলে সাবেক কেজিবি-র লোক, মেনজিসটুর পাণ্ডাদের একজন।'

মেনজিসটুকে 'কালো স্টালিন' বলা হয়, উৎখাত করার পর বুড়ো সম্রাট হাইলে সেলাসিকে হত্যা করেন। ষোলো বছর মার্ক্সিস্ট শাসনে ইথিওপিয়াকে নতজানু অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর স্পনসর ছিল সোভিয়েত রাশিয়া, ওখানে কমিউনিজমের পতন ঘটার পর মেনজিসটুকে উৎখাত করা হয়, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। 'আমার খুব ঠেকা, যে-কোন একজন গাইড হলেই চলে। কথা দিচ্ছি, পরে অভিযোগ করব না।'

'ঠিক আছে, তবে মনে থাকে যেন।' রানাকে আদ্দিস আবাবার একটা ফোন নম্বর দিল নাসিম।

আবার ডায়াল ঘোরাল রানা। আদ্দিসের লাইন পাওয়া এত সহজ হবে ভাবেনি রানা, একবার ডায়াল করতেই অপরপ্রান্ত থেকে ইথিওপিয়ান বাচনভঙ্গিতে মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ সাড়া দিল। রানা ভ্লাদিমির উস্তাভকে চাইতেই মেয়েটা ভাষা বদলে ইংরেজিতে কথা বলল।

'বর্তমানে তিনি সাফারিতে আছেন,' বলল সে। 'আমি তাঁর স্ত্রী, শেফতা রুবি।' রানা জানে, ইথিওপিয়ার মেয়েরা স্বামীর নাম উচ্চারণ করে না। 'আপনি যদি সাফারি সম্পর্কে কিছু জানতে চান, আমি জবাব দিতে পারব।'

হাসপাতালের বাইরে থেকে নিমাকে রেঞ্জ রোভারে তুলে নিল রানা। 'কেমন আছেন সাবরিনা?' জানতে চাইল ও।

'পায়ের অবস্থা ভাল, কিন্তু ম্যাডের জন্যে এখনও খুব কাতর।'

'ওরকম একটা ছানা কালই কিনে দিন।' তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, আমরা যদি আফ্রিকায় যাই, মায়ের কাছ থেকে আপনি বিদায় নিতে পারবেন?'

হেসে ফেলল নিমা। 'বলতে পারেন বিদায় আমি নিয়েই রেখেছি। বান্ধবীরা আছেন, মামির কোন অসুবিধে হবে না।' সীটে একটু ঘুরে বসে রানার দিকে সরাসরি তাকাল নিমা। 'সারাদিন কোথায় ছিলেন? আপনার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।'

'আগে ফ্ল্যাটে ফিরি, তারপর বলব।'

ফ্ল্যাটে ফিরে সরাসরি স্টাডিতে চলে এল রানা। দেরাজ থেকে একটা ফ্যাক্স

কপি বের করে ধরিয়ে দিল নিমার হাতে। 'শিটটায় একটা ছোট্ট প্রাণীর ছবি রয়েছে। এটাকে বলা হয় খান'স ডিক-ডিক, ডোরাকাটা ডিক-ডিক হিসেবে পরিচিত।'

প্রাণীটির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই, আকারে বড় একটা খরগোশের মত। কাঁধ আর পিঠের ব্রাউন চামড়ার ওপর চকলেট রঙের ডোরা, নাকটা এত লম্বা যে শুঁড় বলে মনে হয়। রানার চেহারায় গর্বের ভাব দেখে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকল নিমা, শুধু বলল, 'এটার কি বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে?'

'তাৎপর্য নেই মানে? এই প্রজাতির এটাই সম্ভবত শেষ নমুনা। এতই দুর্লভ, জুলজিস্টরা সন্দেহ করে এটা একটা কাল্পনিক প্রাণী, কোন কালেই অস্তিত্ব ছিল না। ছবি দেখে তারা কি বলেছিল, জানেন? সাধারণ একটা ডিক-ডিকের কাঠামোয় বেজির চামড়া পরানো হয়েছে। এরচেয়ে জঘন্য অভিযোগ কখনও শুনেছেন?'

'আমি হতভম্ব, এরকম অন্যায় কেউ করতে পারে!' হেসে উঠল নিমা।

'ঠাট্টা নয়,' বলল রানা। 'দাঁড়ান, ডায়েরীর অংশটুকু পড়ে শোনাই আপনাকে।' দেরাজ খুলে আরও একটা ফ্যাক্স শিট বের করল রানা। 'তার আগে বলে রাখি, বহু বছর আগে এই বিরল প্রজাতির ডিক-ডিক যিনি শিকার করেছিলেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বস্—নামটা না-ই জানলেন। ডিক-ডিকটা তাঁর ব্যক্তিগত আবিষ্কার ও কালেকশন, ডায়ারামা করে শো কেসে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আমার অনুরোধে ঢাকা থেকে এটা পাঠিয়েছেন, তাঁর ডায়েরীর একটা অংশ সহ। পড়ছি...'

> "২ ফেব্রুয়ারি, ১৯– । অ্যাবে নদীর ক্যাম্প থেকে। আজ সারাদিন বিশাল দুটো হাতিকে ধাওয়া করি, কিন্তু নাগালের মধ্যে পেলাম না। সাংঘাতিক গরম। হাল ছেড়ে দিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ফেরার পথে দেখি ছোট একটা হরিণ নদীর তীরে ঘাস খাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে ফেলে দিলাম ওটাকে। তারপর কাছ থেকে পরীক্ষা করে দেখি, এটা আসলে জীনাস মাডুকা-র সদস্য। এই প্রজাতিটা আগে কখনও দেখিনি আমি। সাধারণ ডিক-ডিকের চেয়ে আকারে এটা বড়, গায়ে ডোরা আছে। এটা সম্ভবত নতুন একটা আবিষ্কার।"

কাগজটা থেকে মুখ তুলল রানা। 'অ্যাবে গিরিখাদে যেতে হলে আমাদের একটা অজুহাত দরকার, ডিক-ডিক সেটা এনে দিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, আমিও এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছিলাম। ইথিওপিয়া সরকার অনুমতি দেবে তো?'

'আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পারলে অবশ্যই দেবে না,' বলল রানা। 'সেজন্যেই তো ডিক-ডিককে ব্যবহার করব আমরা। অনুমতি নিয়ে বহু সাফারি কোম্পানী ইথিওপিয়ায় অপারেশন চালাচ্ছে। প্রয়োজনীয় পারমিট, সরকারের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট, যানবাহন, ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্ট, আইনগত পরামর্শ ইত্যাদি সবই তাদের আছে। এই অভিযানের প্ল্যান ও আয়োজন যদি আমরা করি,

কয়েক মাস সময় লেগে যাবে। সাফারি কোম্পানীর সীল-ছাপ্পড় ছাড়া গেলে লোকাল জঙ্গী গ্রুপগুলোও হুমকি হয়ে দেখা দেবে।'

'তাহলে ডিক-ডিক শিকারী হিসেবে যাব আমরা, যাব একটা সাফারি কোম্পানীর অধীনে?'

'একজন সাফারি অপারেটরের সঙ্গে আদ্দিস আবাবায় এরইমধ্যে যোগাযোগ করেছি আমি, অন্তত প্রথম পর্যায়ে আমরা তার সাহায্য নেব,' বলল রানা। 'প্রয়োজনীয় সূত্র হাতে এলে দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে, তখন আমরা নিজেদের লোকজন আর ইকুইপমেন্ট ব্যবহার করব। তৃতীয় পর্যায়টা হবে ইথিওপিয়া থেকে লুঠের মাল বের করে আনা। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কাজটা সহজ হবে না।'

'সত্যিই তো, বের করব...'

'জিজ্ঞেস করবেন না, কারণ এই মুহূর্তে জবাব দিতে পারব না।'

'কবে রওনা হচ্ছি আমরা?'

'তার আগে আরেকটা প্রসঙ্গ। টাইটার ধাঁধার যে অর্থ আপনারা বের করেছেন, ভিলা থেকে চুরি যাওয়া আপনার নোটে সেটা লেখা ছিল?'

'হ্যাঁ, ছিল। সব কিছুই হয় নোটে নয়তো মাইক্রোফিল্মে ছিল। দুঃখিত।'

'তারমানে আমরা যা জানি প্রতিপক্ষও তাই জানে।'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে আমার সিদ্ধান্ত ঠিক আছে,' বলল রানা। 'অ্যাবে গিরিখাদে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে চাই আমি, প্রতিপক্ষ পৌঁছুবার আগেই। ওরা আপনার ধারণা ও উপসংহার চুরি করেছে প্রায় এক মাস হয়ে এল। কে জানে, হয়তো এরইমধ্যে রওনা হয়ে গেছে।'

'কবে?' আবার জিজ্ঞেস করল নিমা।

'নাইরোবি হয়ে আদ্দিস আবাবায় যাচ্ছি, শনিবারে। প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। হাতে মাত্র দু'দিন সময়, ব্যক্তিগত প্রস্তুতি এর মধ্যেই শেষ করতে হবে আপনাকে। ইয়েলো ফিভার আর হেপাটাইটিস ইঞ্জেকশন নেয়া আছে?'

'আছে।'

'গুড। কায়রো থেকে সবেমাত্র এসেছেন, কাজেই আপনার পাসপোর্ট ঠিক আছে। ইথিওপিয়ার ভিসা লাগবে আমাদের, তবে জানাশোনা লোক আছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব। আর কিছু?'

খপ করে রানার হাতটা ধরে ফেলল নিমা। পরমুহূর্তে মনে মনে জিভ কেটে ছেড়ে দিল। 'সত্যি আমরা যাচ্ছি, তাই না? ওহ্ গড, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না!'

নিমার আনন্দ ও উত্তেজনায় বাঁধ সাধার কোন ইচ্ছে নেই রানার, তবে রওনা হবার আগে শেষ আরেকটা প্রসঙ্গ না তুললেও নয়। 'নিমা,' বলল ও, 'কেন আমরা ওখানে যাচ্ছি সে-সম্পর্কে আপনার পরিষ্কার একটা ধারণা থাকা দরকার। কিসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছেন তা-ও আপনার জানা উচিত।'

'কিসের মধ্যে জড়াতে যাচ্ছি?'

'যদি ভেবে থাকেন,' বলল রানা, 'আর্টিফ্যাক্টের লোভে যাচ্ছি আমি, ভুল হবে। হাসলানকে আমি চিনতাম, তাঁর মত সৎ ও ভালমানুষ আমি খুব কম

দেখেছি। তাঁকে কিভাবে খুন করা হয়েছে শোনার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, সুযোগ পেলে অবশ্যই প্রতিশোধ নেব। আপনার সঙ্গে আবে গিরিখাদে যেতে চাওয়ার সেটাই প্রধান কারণ।'

'ধন্যবাদ,' ম্লান সুরে বলল নিমা। 'আমি কৃতজ্ঞ।'

'দ্বিতীয় কারণটা আপনি জানেন, অ্যাডভেঞ্চার–তার সঙ্গে ব্যবসাও। এবার ঝুঁকির প্রসঙ্গে আসি। ওখানে প্রকৃতি স্বয়ং একটা হুমকি, তবে সেটার কথা বাদ দিচ্ছি এই জন্যে যে জেনেশুনেই ঝুঁকিটা নেব আমরা। কিন্তু ওখানে আরও যে-সব বিপদ আছে, সেগুলো সম্পর্কে ভেবেছেন আপনি?'

'কি ধরনের বিপদ?'

'গেরিলারা কয়েক গ্রুপে ভাগ হয়ে ওখানে যুদ্ধ করছে, কখনও নিজেদের মধ্যে, কখনও সরকারী বাহিনীর সঙ্গে। বিদেশী লোকজনকে একদমই সহ্য করতে পারে না ওরা, বিশেষ করে শ্বেতাঙ্গদের। তার ওপর আপনি একটা মেয়ে।'

চেহারা দেখে বোঝা গেল নিমার ভয় লাগছে। জোর করে হাসল, বলল, 'হাসলান চাচা আপনার ওপর আস্থা রাখতে বলে গেছেন।'

'আরেকটা বিপদ, এটাই আসল বিপদ,' বলল রানা, 'প্রতিপক্ষরা। ওরা যে কতটুকু মরিয়া, হাসলান আর আপনার ওপর হামলার ধরন দেখেই বোঝা যায়। এরকম হামলা একের পর এক আসতেই থাকবে। আমি বলতে চাইছি, নিমা, এখনও সময় আছে, অভিযান বাতিল করে দিতে পারেন।'

'প্রশ্নই ওঠে না!' প্রতিবাদ করল নিমা। 'যত বিপদই থাকুক, আমি যাব।' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল ও। তারপর ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'বিপদে আপনি আমাকে রক্ষা করবেন না?'

'প্রাণ থাকতে আপনার কোন ক্ষতি হতে দেব না,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কিন্তু তবু ভেবে দেখুন...'

'না। এর মধ্যে ভাবনার আর কিছু নেই।'

চার

শনিবার সকালে হিথরোর চার নম্বর টার্মিন্যালে পৌঁছে লাগেজগুলো পরীক্ষা করল রানা। নিমার কাঁধে একটা স্লিং ব্যাগ, আর নিয়েছে নরম একটা ক্যানভাস ব্যাগ। রানার হান্টিং রাইফেলটা লেদারে মোড়া, আলাদা একটা প্যাকেটে রয়েছে একশো রাউন্ড অ্যামুনিশন। ওর সঙ্গে আর শুধু একটা লেদার ব্রীফকেস রয়েছে। মাথায় পানামা হ্যাট, চেক-ইন কাউন্টারে থেমে বসে থাকা মেয়েটার উদ্দেশে মুচকি হাসল।

প্লেন ছাড়ার পর নিমার অনুরোধে দাবার ঘুঁটি সাজাল রানা, বোর্ডটা খোলা হয়েছে দুই সীটের মাঝখানের আর্ম-রেস্টে। কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা

এয়ারপোর্টে যখন প্লেন নামছে, তৃতীয় গেমটা তখনও শেষ হয়নি। দু'জনেই একটা করে জিতেছে, শেষটা অমীমাংসিত থেকে গেল।

নাইরোবির শেরাটন হোটেলে একজোড়া গার্ডেন বাংলো বুক করেছে রানা। নিমা বিছানায় উঠেছে দশ মিনিটও হয়নি, পাশের বাংলো থেকে রানার ফোন পেল। 'আজ রাতে ব্রিটিশ হাই কমিশনে ডিনার খাচ্ছি আমরা। পুরানো বন্ধু, একসঙ্গে অক্সফোর্ডে পড়েছি। নরমাল ড্রেস পরলেই চলবে।'

নাইরোবি থেকে আদ্দিস আবাবা অতটা দূরে নয়, তবে নিচের প্রকৃতি একের পর এক এমন সব বিচিত্র শোভা মেলে ধরছে যে এয়ার কেনিয়া ফ্লাইটের জানালার সঙ্গে আঠার মত সেঁটে থাকল নিমা। মাউন্ট কেনিয়ার চূড়াটাকে অনেক বছর পর মেঘমুক্ত দেখল রানা, তুষার মোড়া জোড়া শৃঙ্গ রোদ লেগে চকচক করছে। তারপর শুরু হলো মরুভূমি, মরুভূমি শেষ হতে ইথিওপিয়ান মালভূমি দেখা গেল। 'আফ্রিকায় ইথিওপিয়ার চেয়ে পুরানো সভ্যতা শুধু মিশর,' নিমাকে বলল রানা।

'হ্যাঁ। চার হাজার বছর আগে টাইটা যখন এই পথ দিয়ে গেছে এই এলাকার লোকজন তখনও সভ্য ছিল। এদের খুব প্রশংসা করেছে ক্রোল্লে, বলেছে, তার কালচারের মতই এদের কালচার উন্নত। এটা একটা ব্যতিক্রমই বলব, কারণ অন্য প্রায় সব জাতিকে নিকৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছে সে।'

প্লেন থেকে নেমে টার্মিন্যাল বিল্ডিঙে চলে এল ওরা। 'স্যার...স্যার মাসুদ রানা!' দু'জনেই ওরা লম্বা এক তরুণীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল, ওদের দিকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে, হাঁটার ভঙ্গিতে নৃত্যশিল্পীর মনকাড়া সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একেই বোধহয় কলঙ্কবিহীন ত্বক বলে, গাঢ় মধুর মত রঙ, লাবণ্যে ভরপুর। মেয়ে হাসতেও জানে, যেন কতদিনের পরিচয়। ঐতিহ্যবাহী পূর্ণ-দৈর্ঘ্য স্কার্ট পরে আছে, হাঁটার সময় ফুলে উঠছে। 'আমার দেশ ইথিওপিয়ায় স্বাগতম, স্যার রানা। আমি শেফতা রুবি।' কৌতূহল আর আগ্রহ নিয়ে নিমার দিকে তাকাল সে। 'আপনি নিশ্চয়ই আল নিমা।' নিমার দিকে ডান হাত বাড়াল সে। রানা লক্ষ করল, প্রথম দর্শনেই মেয়ে দুজন পরস্পরকে পছন্দ করছে।

ওদের পাসপোর্ট নিয়ে চলে যাচ্ছিল রুবি, ফিরে এসে একটা খবর দিল। 'আপনারা ভিআইপি লাউঞ্জে বিশ্রাম নিন। ব্রিটিশ এমব্যাসীর এক ভদ্রলোক ওখানে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। জানি না কিভাবে খবর পেলেন ওঁরা।'

ভিআইপি লাউঞ্জে মাত্র একজন লোককে দেখা গেল, ট্রপিকাল সুট পরা ব্রিটিশ সাবজেক্ট। রানাকে দেখেই সোফা ছেড়ে এগিয়ে এল সে। 'কেমন আছ, দোস্ত? ভাবিনি এত থাকতে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হবে। প্রায় বারো বছর পর, তাই না?'

'হ্যাল্লো, গর্ডন। জানতাম না এখানে চাকরি করছ তুমি।'

'মিলিটারি অ্যাটাশে। হিজ এক্সেলেন্সী নাইরোবি থেকে খবর পান তুমি আসছ। আমাকে জানালেন, কারণ উনি জানেন তুমি আমার পুরানো বন্ধু, ব্রিটিশ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে একসঙ্গে ট্রেনিং নিয়েছি।' আগ্রহ চেপে রাখতে পারছে না, বারবার নিমার দিকে তাকাচ্ছে। খানিকটা হতাশ ভঙ্গি করে তার সঙ্গে নিমার

পরিচয় করিয়ে দিল রানা।

'ব্যারি গর্ডন। আপনাকে একটু সাবধানে থাকার পরামর্শ দেব। বিষুব রেখার উত্তরে সবচেয়ে নামকরা প্লেবয়। ওর আধ মাইলের মধ্যে কোন মেয়েই নিরাপদ নয়।'

'হয়েছে, এতটা বাড়িয়ে বলতে হয় না!' রানা তার যে পরিচয় দিল, তাতে গর্ডনকে গর্বিত ও তৃপ্ত মনে হলো। 'প্লীজ, এই লোক যা বলছে তার একটা কথাও বিশ্বাস করবেন না, ডক্টর আল নিমা। কুখ্যাত নিন্দুক।'

রানাকে টেনে একপাশে সরিয়ে আনল গর্ডন। রাজধানীর বাইরে দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভীতিকর একটা ধারণা দিল সে। 'এইচ.ই. একটু উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে গোজাম-এর ওদিকে শয়তানদের বসবাস। উনি চান না আল নিমাকে নিয়ে ওদিকে যাও তুমি। আমি অবশ্য বলেছি, নিজেকে তুমি রক্ষা করতে জানো।'

খুব অল্প সময়ের ভেতর কাজ সেরে ফিরে এল শেফতা রুবি। 'আপনাদের লাগেজ, ফায়ার আর্মস আর অ্যামুনিশনের কাস্টমস ক্লিয়ার‍্যান্স পাওয়া গেছে। এটা আপনাদের সাময়িক পারমিট, ইথিওপিয়ায় যতক্ষণ থাকবেন সঙ্গে রাখতে হবে। পাসপোর্টগুলোও রাখুন, ভিসায় সীল মারা হয়েছে। এক ঘণ্টা পর লেক টানা ফ্লাইট, কাজেই হাতে কিছুটা সময় আছে।'

'যদি কখনও চাকরি পেতে অসুবিধে হয়, আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন,' মেয়েটার দক্ষতার প্রশংসা করল রানা।

ওদের সঙ্গে ডিপারচার গেট পর্যন্ত হেঁটে এল গর্ডন। 'বিপদ হলে আমরা আছি। তবে খবরটা সময়মত পেতে হবে।'

'আমার মনে থাকবে,' বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করল রানা।

টুইন অটার বিমান ওদেরকে সুউচ্চ গগনে তুলে আনলেও নিচের জমিন এত কাছে যে গ্রাম আর খেতগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এর কারণ পাহাড়ী এলাকার ওপর রয়েছে প্লেন। তারপর নিচে একটা মালভূমি দেখা গেল, অকস্মাৎ সেটার সামনে মুখ ব্যাদান করে থাকতে দেখা গেল বিশাল এক গিরিখাদকে, আকারে এতই বড় যে কল্পনাকেও যেন হার মানায়। 'অ্যাবে নদী!' সীট থেকে সামনের দিকে ঝুঁকতে হলো নিমাকে রানার কাঁধে টোকা দেয়ার জন্যে।

খাদটার কিনারা বা ধার খাড়া ও স্পষ্টভাবে কাটা, আর তারপরই ত্রিশ ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে নেমে গেছে ঢাল। মালভূমির ফাঁকা ও নিঃস্ব সমতল জমিন জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ঘন বন-জঙ্গলে আচ্ছাদিত খাদের পাঁচিলগুলোকে। এখানে সেখানে জঙ্গল ভেদ করে মাথাচাড়া দিয়ে আছে বাতিদানে সাজানো লম্বা মোমের মত পাথরের বিশাল সব স্তম্ভ, এককেটা পাঁচ-সাত তলা বাড়ির মত বড়। কোথাও কোথাও ধসে পড়েছে পাঁচিল, সেখানে শুধু ক্যেটি কোটি টন আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে। পাঁচিলের গায়ে ব্লাফ তৈরি হয়েছে, সেগুলোর বিস্তার ক্রমশ ওপর দিকে, মাথার দিকে কোনটার চেহারা সুচের মত, কোনটা আবার প্রকৃতির তৈরি ভাস্কর্য শিল্প, ঠিক যেন মানুষের আকৃতি।

ঢাল নেমেছে তো নেমেছেই, যেন কোন শেষ নেই, তারপর দুই ঢাল যেখানে

দৃষ্টিভ্রমের কারণে মিলিত হয়েছে বলে মনে হলো, এক মাইল বা আরও বেশি গভীরে, সেখানে চিকচিক করতে দেখা গেল সাপের মত আঁকাবাঁকা নদীটাকে। কুপি বা চিমনি আকৃতির ওপরের পাঁচিল দ্বিতীয় একটা কিনারা তৈরি করেছে নীল নদের পানি থেকে পাঁচশো ফুট ওপরে, এই অংশটাকে উপ-খাদ বলা যেতে পারে। উপখাদের পাঁচিলগুলো একদমই খাড়া, মাঝখানে লাল স্যান্ডস্টোনের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে নদী। কোথাও কোথাও খাদটা চল্লিশ মাইল চওড়া, আবার কোথাও মাত্র দশ। তবে পুরো দৈর্ঘ্য জুড়েই ভীতিকর গাম্ভীর্য আর অশেষ নির্জনতা বাসা বেঁধে আছে। মানুষের কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না।

'ওখানেই আপনারা নামতে যাচ্ছেন,' ভয় ও শ্রদ্ধা মেশানো কণ্ঠস্বর, ফিসফিস করল শেফতা রুবি। রানা বা নিমা কথা বলছে না। এ-ধরনের আদিম, রোমহর্ষক ও রহস্যময় প্রকৃতির মুখোমুখি হলে সব ভাষাই হারিয়ে যায়।

প্রায় স্বস্তির সঙ্গে দেখল, ওদের নাগাল পাবার জন্যে উঠে আসছে উত্তরের পাঁচিল–দীর্ঘ নীল আফ্রিকান আকাশের গায়ে মাথা তুলে দাঁড়াল চোক রেঞ্জের সারি সারি উঁচু পাহাড়, ওদের খুদে ও ভঙ্গুর প্লেনের চেয়ে অনেক ওপরে।

বাঁক ঘুরে সেই পর্বতশ্রেণীর ভেতর ডাইভ দিল প্লেন। স্টারবোর্ড উইংটিপের দিকে হাত তুলল রুবি।

'লেক টানা,' বলল সে। চওড়া পাত্রে ঢালা পারদের মত টলটল করছে লেকের পানি। টানা লেক লম্বায় পঞ্চাশ মাইল, এখানে সেখানে মাথা তুলেছে কয়েকটা দ্বীপ, প্রতিটিতে একটা করে মঠ বা প্রাচীন চার্চ আছে। ল্যান্ড করার জন্যে লেকের ওপর দিয়ে শেষবার ওড়ার সময় প্যাপাইরাসের তৈরি খুদে বোটে সাদা আলখেল্লা পরা পাদ্রীদের দেখতে পেল ওরা, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাচ্ছে।

লেকের পাশে মেঠো স্ট্রিপে ল্যান্ড করল অটার, পিছনে ধুলোর মেঘ উঠল। তাল পাতার গায়ে রঙিন নকশা করা কয়েকটা ঘর, এটাই এখানকার টার্মিন্যাল বিল্ডিং। রোদ এত উজ্জ্বল যে খাকি জ্যাকেটের পকেট থেকে সানগ্লাস বের করে পরতে হলো রানাকে। প্লেন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ও। সাদা ও নোংরা টার্মিন্যাল ভবনের গায়ে বুলেটের গর্ত দেখা গেল, রানওয়ের কিনারায় ঘাসের ওপর পড়ে রয়েছে একটা রাশিয়ান টি-থারটিফাইভ ব্যাটল ট্যাংকের পোড়া খোল। রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অন্যান্য আরোহীরা বেরিয়ে এল, বিল্ডিঙের পাশে ইউক্যালিপটাস গাছের ছায়ায় তাদের অস্থির আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে একটাই মাত্র গাড়ি, বালি রঙের টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার। ড্রাইভারের দরজায় বড় বড় হরফে লেখা–'ওয়াইল্ড গেম সাফারি'।

মেয়ে দুজনকে নিয়ে নিচে নামল রানা। গাড়ি থেকে নেমে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। তার পরনে রঙচটা বুশ সুট। লম্বা সে, রোগা না হলেও গায়ে চর্বি নেই, হাঁটার সময় সামান্য ঝাঁকি খায় শরীর। রানা আন্দাজ করল চল্লিশের কাছাকাছি বয়েস হবে। কটা রঙের চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখ নিস্প্রভ ও নীলচে। মুখে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন আছে, নাক ছুঁয়ে দেয়ায় সেটা বিকৃত দেখাচ্ছে।

রুবি প্রথমে তার সঙ্গে নিমার পরিচয় করিয়ে দিল।

নিমা করমর্দন না করায় ভুরু কুঁচকে বাউ করল লোকটা। এরপর রুবি রানার পরিচয় দিল। 'ইনি আমার স্বামী, ভাদিমির উস্তাভ। মির, ইনি মাসুদ রানা।'

'আমার ইংলিশ ভাল নয়,' বলল উস্তাভ। 'ফ্রেঞ্চ খানিকটা ভাল।'

'কোন অসুবিধে নেই,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় জবাব দিল রানা। 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।' হাত বাড়াল ও।

হ্যান্ডশেকের অজুহাতে রানার হাতটা মুচড়ে দিতে চেষ্টা করল উস্তাভ। সতর্ক ছিল রানা, এ-ধরনের আধ-বুড়ো শয়তানদের চেনা আছে, মুঠোয় এতটা জোর ছিল যে সুবিধে করতে পারল না উস্তাভ। রানার ঠোঁটে অলস হাসি। প্রথমে ঢিল দিতে হলো উস্তাভকে, ক্ষীণ হলেও শ্রদ্ধার ভাব ফুটল নীলচে চোখে।

'আপনি তাহলে ডিক-ডিকের খোঁজে এসেছেন?' প্রশ্ন তো নয়, প্রায় খেঁকিয়ে উঠল লোকটা। 'অথচ লোকে আমার কাছে আসে বড় হাতি শিকার করার জন্যে।'

'বড় হাতিকে ভয় পাই,' হাসল রানা। 'ডিক-ডিক আমার জন্যে মানিয়ে যায়।'

'খাদে আগে কখনও নেমেছেন?'

'দু'বার,' জবাব দিল নিমা, দু'জনের মাঝখানে নীরব উত্তেজনা অনুভব করতে পারছে ও।

স্ত্রীর দিকে ফিরল উস্তাভ। 'আমার অর্ডার মত সমস্ত রসদ আনা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, মির,' কেমন যেন ভয়ে ভয়ে জবাব দিল রুবি। 'প্লেনে আছে সব।'

টয়োটার সামনের সীটে বসল পুরুষরা, অসংখ্য প্যাকেট আর রসদ নিয়ে মেয়েরা বসল পিছনে। 'ঘুরে ফিরে সব কিছু তাহলে দেখার ইচ্ছে নেই আপনাদের?' রানাকে জিজ্ঞেস করল উস্তাভ, গলার আওয়াজ হুমকির মত শোনাল।

'মানে?'

'লেকের আউটলেট, পাওয়ার স্টেশন, খাদের ওপর পর্তুগাল ব্রিজ, নীল নদের উৎসমুখ–দেখার জিনিস অনেকই আছে। দেখতে চাইলে সন্ধের আগে ক্যাম্পে ফেরা সম্ভব নয়।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'তবে এ-সব আগেই দেখা আছে আমার।'

সারি সারি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেছে রাস্তাটা। এলাকাটার নাম গোজাম, রাস্তার ধারে প্রচুর লোকজন দেখা গেল। সবাই খুব লম্বা, ছাগল বা ভেড়া চরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুরুষ ও নারী সবাই প্যান্ট পরা, তবে মেয়েদের ব্লাউজের ওপর উলেন শাল আছে। ইথিওপিয়ার সব এলাকার মত গোজামের লোকজনও দেখতে খুব সুন্দর। মেয়েরা কালো হলে কি হবে, রূপ-যৌবন যেন উথলে পড়ছে। পুরুষরা বেশিরভাগই সশস্ত্র। একে-ফরটিসেভেন অ্যাসল্ট রাইফেল তো আছেই, আরও আছে দু'ধারি তলোয়ার।

গ্রামের কুঁড়েগুলো গোল, ইউক্যালিপটাস অথবা সাইসল গাছের নিচে।

চোক রেঞ্জের চূড়ায় লালচে-বেগুনি মেঘের তুমুল আলোড়ন শুরু হলো। চাঁদির তৈরি সিকির মত বৃষ্টির ফোঁটাগুলো, কিছুক্ষণ ঝরেই থেমে গেল। তাতেই কাদায় থকথকে হয়ে উঠল রাস্তা।

খানিক পর শুরু হলো পাথুরে খানা-খন্দ। এমনকি ফোর-হুইল ড্রাইভ টয়োটার পক্ষেও এ-সব বাধা পেরিয়ে এগোনো সম্ভব নয়। ঘুরপথ ধরতে হলো, মাঝে মধ্যে গাড়ি এগোচ্ছে হাঁটা গতিতে, তাসত্ত্বেও অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে আরোহীরা।

'কালাদের জানোয়ার বললেই হয়,' উস্তাভের গলায় ঘৃণা। 'রাস্তা মেরামত করার কথা চিন্তাও করে না।' কেউ কিছু বলছে না, তবে রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রেখে মেয়ে দুটোকে দেখল রানা। দু'জনেই নির্লিপ্ত।

সামনে আরও খারাপ রাস্তা পড়ল। ভারী যানবাহন চলাচল করায় চাকার ঘর্ষণে দীর্ঘ নালা তৈরি হয়েছে। 'মিলিটারি ট্রাফিক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু কিছু,' জবাব দিল উস্তাভ। 'এদিকে শুফতাদের তৎপরতা খুব বেশি। শুফতা হলো ডাকাত সর্দার আর দলত্যাগী সমর নায়ক। প্রসপেক্টিং কোম্পানীর ট্রাকও আসা-যাওয়া করে। বড় একটা মাইনিং কোম্পানী গোজামে কনসেশন পেয়েছে, ড্রিলিং করার জন্যে পৌঁছে গেছে তারা।'

'আমরা কিন্তু এখনও কোন সিভিলিয়ান ভেহিক্ল দেখিনি,' বলল নিমা। 'এমনকি পাবলিক বাসও না।'

ব্যাখ্যা দিল রুবি, 'এক সময় ইথিওপিয়াকে আফ্রিকার রুটির ঝুড়ি বলা হত, কিন্তু মেনজিসটু ক্ষমতায় এসে ইকোনমির বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। খাদ্য এখানে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দেশ এখন স্বৈরাচার মুক্ত হলেও, দুর্দশা কাটতে আরও সময় লাগবে। মোটর কিনবে এমন সঙ্গতি হাতে গোনা মাত্র কয়েকজনের আছে। ছেলেমেয়েদের কি খাওয়াবে, এই চিন্তাতেই পাগল হয়ে আছে সবাই।'

'আদ্দিস ইউনিভার্সিটি থেকে ইকোনমিক্সে ডিগ্রী নিয়েছে রুবি,' কর্কশ হাসির সঙ্গে বলল উস্তাভ। 'সব কিছু জানে সে, একটু বেশিই জানে!' স্ত্রীর প্রতি এটা তার ধমকও বলা যায়, বিদ্রূপও বলা যায়। রুবি আর কোন কথা বলল না।

বিকেলের দিকে ম্লান সূর্য উঠল। ফাঁকা একটা এলাকার মাঝখানে গাড়ি থামাল উস্তাভ। 'আঙুল মটকাবার বিরতি। পানি ছাড়ার সময়।'

মেয়ে দুজন ট্রাক থেকে নেমে বোল্ডারের আড়ালে চলে গেল। ফিরে এল কাপড় পাল্টে। ঢোলা প্যান্টের ওপর ব্লাউজ পরেছে, ব্লাউজের ওপর উলেন চাদর। 'এগুলো রুবি আমাকে ধার দিয়েছেন,' রানাকে বলল নিমা।

'কাজের জন্যে সালোয়ার-কামিজের চেয়ে এগুলোই ভাল,' মন্তব্য করল রানা।

ট্রাক যখন আরেকটা পাথুরে উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে, দিগন্তে নেমে আসছে সূর্যও। পাশেই একটা নদী, পাড় ক্ষয়ে গেছে। নদীর ওপর একটা চার্চ, নল খাগড়া আর পাতায় ছাওয়া ছাদের ওপর কাঠের কপটিক ক্রস বসানো হয়েছে, দেয়ালগুলো স্যাদা। গ্রামটা দাঁড়িয়ে আছে চার্চকে ঘিরে।

'ডেবরা মারিয়াম,' বলল উস্তাভ। 'ভার্জিন মেরীর পাহাড়। আর নদীর নাম ডানডেরা। বড় একটা ট্রাকে আমার লোকজনকে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ক্যাম্প রেডি করে অপেক্ষা করছে তারা। আজ রাতে এখানেই আমরা ঘুমাব, কাল ভাটি

ধরে এগোব যতক্ষণ না খাদের কিনারায় পৌঁছাই।'

গ্রামের ঠিক সামনে ক্যাম্প ফেলা হয়েছে। 'দ্বিতীয় তাঁবুটা আপনাদের,' রানাকে জানাল উস্তাভ।

'ওটা নিমার জন্যে,' বলল রানা। 'আমার নিজের একটা আলাদা তাঁবু দরকার।'

'ডিক-ডিক শিকার করতে এসে আলাদা তাঁবু?' উস্তাভের চোখে নগ্ন বিস্ময়। 'আপনি আমাকে তাজ্জব করলেন, স্যার!' চেঁচামেচি করে লোকজনকে ডাকল সে, আরেকটা তাঁবু টাঙাবার নির্দেশ দিল। দ্বিতীয়টার পাশেই টাঙানো হলো সেটা। 'রাতে আপনার সাহস বাড়তে পারে। চাই না বেশি দূর হাঁটতে হোক আপনাকে।'

ব্লু গাম গাছের নিচু ডালে একটা ড্রাম ঝোলানো হয়েছে, ড্রামের নিচে শুকনো পাতার তৈরি অসংখ্য ফুটোঅলা দেয়াল, ওপরে ছাদ নেই–এটাই ওদের বাথরুম বা শাওয়ার। প্রথমে ব্যবহার করল নিমা, বেরিয়ে এল তাজা চেহারা নিয়ে, মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়ানো, মুখে হাসি। 'আপনার পালা, রানা!' রানার তাঁবুকে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হাঁক ছাড়ল। 'পানি খুব গরম!'

রানার শাওয়ার সেরে কাপড় বদলাতে সন্ধে হয়ে গেল। সোজা হেঁটে এসে ডাইনিং তাঁবুতে ঢুকল, আগেই এখানে জড়ো হয়েছে সবাই। আগুনের চারপাশে ফেলা হয়েছে ক্যাম্পচেয়ার, একটাতে বসল রানা। মেয়ে দুটো বসেছে উল্টোদিকে, কথা বলছে নিচু গলায়। হাতে গ্লাস নিয়ে নিচু টেবিলে পা তুলে দিয়েছে উস্তাভ। রানা বসতেই ইঙ্গিতে ভদকার বোতলটা দেখাল। 'বাস্কেটে বরফ আছে।'

কথা না বলে মাথা নাড়ল রানা। গলাটা অবশ্য শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, মনে মনে ভাবল বিয়ার পেলে মন্দ হত না।

'গোপন একটা কথা বলি,' রানাকে বলল উস্তাভ। 'আজকাল ডোরা কাটা ডিক-ডিক বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। আদৌ কোন কালে ছিল কিনা তা-ও আমার সন্দেহ আছে। আপনি টাকা আর সময় অপচয় করতে এসেছেন।'

'অসুবিধে কি,' বলল রানা। 'ওগুলো তো আমারই।'

'দশ দিন আগে তিনটে হাতির ছাপ দেখেছি, মদ্দা হাতি,' বলল উস্তাভ। 'একেকটা দাঁত একশো পাউন্ডের কম নয়।'

কথা কাটাকাটি চলছে, উস্তাভের ভদকার বোতল নীল নদ থেকে বন্যা নেমে যাবার মত দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে। রুবি যখন বলল ডিনার রেডি, বোতলটা সঙ্গে নিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে। টেবিলের দিকে এগোবার সময় টলতে দেখা গেল তাকে। খেতে বসে রুবিকে কথায় কথায় ধমক দেয়া ছাড়া আর কোন অবদান রাখল না। 'ভেড়ার মাংস সেদ্ধ হয়নি কেন? কুকের ওপর চোখ রাখোনি কেন? ওরা তো কুত্তার বাচ্চা, তুমি জানো।'

'আপনার মাংস কি সেদ্ধ হয়নি, স্যার রানা?' স্বামীর দিকে না তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রুবি। 'বললে কুককে দিয়ে সেদ্ধ করে আনাই।'

'একদম নিখুঁত রান্না হয়েছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তুলোর মত নরম মাংস আমি পছন্দ করি না।'

ডিনারের শেষ দিকে দেখা গেল উস্তাভের বোতল খালি হয়ে গেছে। টকটকে লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা, মনে হলো ফুলেছেও। টেবিল থেকে উঠে কারও সঙ্গে কথা বলল না, নিজের তাঁবুর দিকে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

'ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি আমি। এ শুধু সন্ধের দিকে ঘটে। দিনের বেলা একদম শান্ত ভদ্রলোক। ভদকা ওদের রাশিয়ান ঐতিহ্য।' উজ্জ্বল হাসি দিল রুবি, শুধু চোখ দুটোয় বিষাদের ছায়া লেগে থাকল। নিস্তব্ধতা ভারী হয়ে উঠতে চার্চ পর্যন্ত হেঁটে আসার প্রস্তাব দিল সে। ওরা রাজি হতে একজন চাকরকে ডেকে লণ্ঠন আনাল।

কপটিক চার্চে ঢুকে প্রার্থনায় বসল নিমা আর রুবি, রানা মিউরালের ছবি তুলল পোলারয়েড ক্যামেরায়। ফেরার পথে কোন কথা হলো না।

'রানা! রানা! উঠুন, প্লীজ!' ধাক্কা দিয়ে রানার ঘুম ভাঙাল নিমা। উঠে বসে টর্চ জ্বালল ও, দেখল ঢোলা প্যান্ট আর ব্লাউজের বদলে সালোয়ার-কামিজ পরেছে নিমা, তাড়াহুড়োয় ওড়না নিয়ে আসতে ভুলে গেছে।

'কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা, তবে নিমা জবাব দেয়ার আগেই উস্তাভের কর্কশ গর্জন আর খিস্তি শুনতে পেল, রাতের নিস্তব্ধতাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে তার তাঁবু থেকে ভেসে আসছে। আরও একটা রোমহর্ষক শব্দ পেল রানা, শক্ত মুঠো দিয়ে মাংস ও হাড়ে আঘাত করলেই শুধু এ ধরনের আওয়াজ হতে পারে।

'মেয়েটাকে মারছে,' রাগে কেঁপে গেল নিমার গলা। 'যেভাবে পারেন থামান আপনি।'

প্রতিটি আঘাতের পর ব্যথায় চিৎকার করছে রুবি, তারপর ফোঁপাচ্ছে। ইতস্তত করছে রানা। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ায় শুধু একজন বোকা নাক গলায়, এবং সাধারণত পুরস্কার হিসেবে তার কপালে জোটে অকস্মাৎ ঐকমত্যে পৌঁছুনো স্বামী-স্ত্রীর কঠোর নিন্দা।

'কিছু একটা করুন, রানা! প্লীজ!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কট থেকে নামল রানা। শুধু শর্টস পরে রয়েছে ও। জুতো খোঁজার ঝামেলায় গেল না, বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে। নিমা ওর পিছু পিছু আসছে, ওর পা-ও খালি।

ওদের তাঁবুর ভেতর লণ্ঠন জ্বলছে এখনও, ক্যানভাসের দেয়ালে বড় আকৃতির ছায়া নড়াচড়া করছে। রানা দেখল উস্তাভ তার স্ত্রীর চুল ধরে হিড়হিড় করে মেঝের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, গর্জন করছে রুশ ভাষায়।

'উস্তাভ!' মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে তিনবার চিৎকার করতে হলো রানাকে। রুবিকে ছেড়ে দিয়ে তাঁবুর ফ্ল্যাপ তুলল উস্তাভ। শুধু আন্ডারপ্যান্ট পরে আছে সে। শরীরে কিলবিল করছে পেশী, তবে বুকটা চ্যাপ্টা ও লোহার মত শক্ত মনে হলো, কোঁকড়ানো সোনালি চুলে ঢাকা। তার পিছনে মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে রুবি, উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে ফোঁপাচ্ছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ মেয়েটা, তার শরীরের সমতল অংশগুলো সাপের চামড়ার মত মসৃণ।

'রাত দুপুরে এ-সব কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, অনেক কষ্টে রাগ চেপে

রাখছে। শান্ত সরল একটা মেয়ের এই অপমান সহ্য করার মত নয়।

'কালো বেশ্যাটাকে ভদ্রতা শেখাচ্ছি,' খেঁকিয়ে উঠল উস্তাভ। 'আপনার কোন ব্যাপার নয়, মিস্টার। তবে আপনিও যদি ঝাল মাংসের খানিকটা ভাগ চান, সেটা আলাদা কথা।' হেসে উঠল সে, আওয়াজটা শুনে গা ঘিন ঘিন করে উঠল রানার।

'আপনি সুস্থ, শেফতা রুবি? আমাদের সাহায্য দরকার থাকলে বলুন।' কথাগুলো বলার সময় উস্তাভের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, নগ্ন শরীরটার দিকে তাকিয়ে রুবিকে আরও অপমান করতে ইচ্ছুক নয়।

কোন রকমে উঠে বসল রুবি, ভাঁজ করা হাঁটু তুলল বুকের সামনে, নগ্নতা ঢাকার জন্যে সে-দুটোকে হাত দিয়ে আলিঙ্গন করল। 'আমি ভাল আছি, স্যার রানা। ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার চেয়ে আপনারা চলে যান, প্লীজ।' তার নাক থেকে গড়ানো রক্ত ঠোঁট ভিজিয়ে দিচ্ছে, লাল হয়ে উঠছে সাদা দাঁতগুলো।

'আমার স্ত্রী তোমাকে নিজের চরকায় তেল দিতে বলছে, ইউ ব্ল্যাক বাস্টার্ড! ভাগো, যাও! তা না হলে এমন শিক্ষা দেব…।' টলতে টলতে এগিয়ে এল উস্তাভ, ঘুসি তুলল রানার বুক লক্ষ্য করে।

সাবলীল অনায়াস ভঙ্গিতে সরে গেল রানা, উস্তাভকে ঠেলে দিল যেদিকে তার এগোবার ঝোঁক। ভারসাম্য হারিয়ে তাঁবুর সামনে খোলা জায়গায় আছাড় খেলো সে, পড়ার সময় একটা ক্যাম্প চেয়ারকেও সঙ্গে নিল।

'প্লীজ, এ-সব করবেন না!' এখনও ফোঁপাচ্ছে রুবি। 'ও রেগে গেলে মানুষ থাকে না। আপনার সঙ্গে যদি পেরে না ওঠে, দেখবেন কারও না কারও ক্ষতি করবে।'

'নিমা, রুবিকে আপনার তাঁবুতে নিয়ে যান,' নরম সুরে নির্দেশ দিল রানা। ছুটে তাঁবুতে ঢুকল নিমা, কট থেকে চাদর তুলে এনে জড়িয়ে দিল রুবির গায়ে, তারপর তাকে দাঁড় করাল।

রুবিকে নিয়ে নিজের তাঁবুর দিকে এগোচ্ছে নিমা, এই সময় উঠে দাঁড়াল উস্তাভ। হুঙ্কার ছাড়ল সে, উল্টে পড়া ক্যাম্প চেয়ার হাতে নিল। মাটিতে আছাড় মেরে চেয়ারের একটা পা ভাঙল সে, সেটা নিয়ে এগিয়ে এল রানার দিকে। 'খেলতে চাও, তাই না, কালা কুত্তা? এসো তাহলে, হয়ে যাক!' ধেয়ে এল রানার দিকে, নিনজা ব্যাটনের মত হাতের কাঠ ঘোরাল। বাতাসে শিস কেটে রানার মাথার দিকে ছুটে এল পায়াটা।

ঝট করে মাথা নিচু করল রানা, লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় পায়াটা এরপর ওর বুক বরাবর নামিয়ে আনল উস্তাভ। লাগলে পাঁজরের হাড় গুঁড়িয়ে যেত, তবে শেষ মুহূর্তে মোচড় খেয়ে সরে গেল রানা।

একটা বৃত্ত ধরে ঘুরছে ওরা, তারপর আবার হামলা করল উস্তাভ। ভদকা খাওয়ায় তার রিফ্লেক্স ভোঁতা হয়ে গেছে, তা না হলে এরকম শক্ত ও অভিজ্ঞ প্রতিপক্ষের সঙ্গে লাগতে যাবার আগে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত রানা। উস্তাভের পায়াটা আরেকবার বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ওর মাথার দিকে, এবারও ঝট করে নিচু হয়ে আঘাতটা এড়াল ও। তারপর সিধে হলো, কষে একটা ঘুসি মারল উস্তাভের তলপেটে। হুসস করে বাতাস বেরিয়ে এল, ফুসফুস খালি হয়ে গেল

উস্তাভের। হাত থেকে ছিটকে পড়ল পায়া, কুঁজো হলো শরীরটা, তারপর পড়ে গেল মাটিতে। হেঁটে এসে তার সামনে দাঁড়াল রানা। 'দুটো ব্যাপারে তোমাকে প্রথম ও শেষবার সাবধান করে দিচ্ছি, ভ্লাদিমির উস্তাভ। কালো বলে কাউকে গাল দেবে না। আর মেয়েদের গায়ে হাত দেয়া চলবে না।'

পাঁচ

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে পরম বন্ধুর মত রানাকে অভ্যর্থনা জানাল উস্তাভ। 'গুড মর্নিং, স্যার রানা! কাল রাতে খুব মজা করলাম আমরা, কি বলেন? মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পাচ্ছে। সাম গুড জোকস! এই যে, নারী জাগরণের প্রতীক, তোমার নতুন বয়ফ্রেন্ডকে নাস্তা খেতে দাও! কাল রাতে ওরকম খেলাধুলোর পর ওঁর খুব খিদে পেয়েছে।'

রুবি নির্লিপ্ত ও বিষণ্ণ, চাকরদের নাস্তা পরিবেশন তদারক করছে। একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হয়ে আছে, নিচের ঠোঁট কাটা। রানার দিকে সে একবারও তাকাচ্ছে না।

'আমরা আগে রওনা হব,' কফি খাবার সময় ব্যাখ্যা করল উস্তাভ। ক্যাম্প তুলে বড় ট্রাকে চড়ে পিছু নেবে চাকররা। ভাগ্য ভাল হলে আজ রাতে খাদের কিনারায় ক্যাম্প ফেলতে পারব। নামতে শুরু করব কাল।'

ট্রাকে ওঠার সময় উস্তাভের কান বাঁচিয়ে দু'একটা কথা বলল রুবি। 'ধন্যবাদ, মিস্টার রানা। তবে কাজটা আপনি ভাল করেননি। আপনি ওকে চেনেন না। আপনাকে এখন থেকে সাবধান থাকতে হবে। ও ভোলে না, ক্ষমাও করে না।'

ডেবরা মারিয়াম গ্রাম থেকে একটা শাখা পথ ধরে এগোল ওরা, ডানডেরা নদীর পাশ দিয়ে এগিয়েছে। রাতে বৃষ্টি হওয়ায় রাস্তার অবস্থা খুবই করুণ, ট্রাক ঠেলার জন্যে বারবার কাদায় নামতে হলো রানাকে। বড় ট্রাকটা এক সময় ধরে ফেলল ওদেরকে। উস্তাভ সারাক্ষণ গজগজ করছে। 'আমার কথা শুনলে এই ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হত না। রাস্তা নেই, শিকারও নেই, তবু যাব!'

বিকেলে লাঞ্চ খাবার জন্যে নদীর ধারে থামল ওরা। হাত-পা থেকে কাদা ধোয়ার জন্যে পানিতে নামল রানা, পিছু নিয়ে নিমাও নেমে এল। নদীর পানি হলুদ হয়ে আছে, বৃষ্টি হওয়ায় ভরাট হয়ে গেছে। 'ডোরা কাটা ডিক-ডিকের গল্প উস্তাভ বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না,' রানাকে সাবধান করে দিল নিমা। 'রুবি বলছেন, আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ আছে তার।' বুক আর বাহু ধোয়ার সময় রানার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

'লাগেজ হাতড়াতে পারে,' বলল রানা। 'আপনার লাগেজে কোন কাগজ-পত্র

বা নোট নেই তো?'

'শুধু স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ আছে, আর নোটবুকে যা আছে তার সবই শর্টহ্যান্ড–উস্তাভ বুঝবে না।'

'রুবির সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান।'

'তিনি খুব সরল। কারও ক্ষতি করবেন না।'

'উস্তাভ তার স্বামী, ভুলে যাবেন না। অনুভূতি যা-ই বলুক, দু'জনের কাউকেই বিশ্বাস করার দরকার নেই।' শার্টটা ধুয়ে নিল রানা, ভিজেই পরল। 'চলুন।'

ট্রাকের কাছে ফিরে ওরা দেখল, সাউথ আফ্রিকান হোয়াইট ওয়াইনের বোতল খুলছে উস্তাভ। রুবি ওদেরকে ঠাণ্ডা চিকেন রোস্ট আর হাতে তৈরি রুটি পরিবেশন করল। খাওয়া শেষ হতে রানার পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে দাড়িঅলা এক শকুনের দূর নীলিমায় ভেসে যাওয়া দেখল নিমা। যাবার সময় হতে নিমার হাত ধরে দাঁড় করাল রানা। শারীরিক সংস্পর্শে দুর্লভ একটা মুহূর্ত, রানার আঙুলগুলো প্রয়োজনের চেয়ে এক কি দু'সেকেন্ড দেরি করে ছাড়ল নিমা।

রাস্তার অবস্থা ভাল হওয়া তো দূরের কথা, আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। অতি কষ্টে একটা চড়াই পেরিয়ে এসে উতরাই ধরে নামতে শুরু করল ট্রাক। অর্ধেক দূরত্ব নামার পর চুলের কাঁটার মত বাঁক পড়ল। বাঁকটা ঘুরতেই দেখা গেল বিশাল একটা ট্রাক, প্রায় ট্র্যাক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। শুনেছে বটে এই পথে প্রচুর ভারী যানবাহন চলাচল করে, তবে এই প্রথম একটাকে দেখল ওরা। খুব সাবধানে ও কৌশলে ট্রাক আর উঁচু পাড়ের মধ্যবর্তী সরু ফাঁক গলে সামনে বাড়ল উস্তাভ।

পিছনের সীটে বসেছে নিমা, জানালা দিয়ে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্রাকটা দেখতে পেল। সবুজের ওপর লাল রঙে লেখা হয়েছে কোম্পানীর নাম, লোগোটাও একই রঙের। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। মনে হলো, এই লোগো কিছুদিন আগে দেখেছে। অথচ মনে করতে পারছে না ঠিক কবে বা কোথায়।

বাকি পথ চুপচাপ গম্ভীর হয়ে থাকল নিমা। বারবার শুধু মনে হচ্ছে ডানাওয়ালা ঘোড়ার লোগো আগেও কোথাও দেখেছে। লাল লোগোর ওপর কোম্পানীর নাম লেখা–প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন।

দিনের শেষ ট্র্যাকের পাশে একটা সাইনপোস্ট দেখল ওরা। পোস্টের পায়াগুলো কংক্রিটে গাঁথা, লেখাগুলো প্রফেশনাল কারও হাতের কাজ। বোর্ডের মাথায় একটা তীরচিহ্ন আঁকা, নির্দেশ করছে বুলডোজার দিয়ে সমান করা নতুন একটা রাস্তা, বাঁক ঘুরে ডান দিকে চলে গেছে। তার নিচের লেখাগুলো পড়ল নিমা–

প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন
বেস ক্যাম্প–ওয়ান কিলোমিটার
প্রাইভেট রোড
নো এন্ট্রি টু আনঅথোরাইজড ট্রাফিক

লাল ঘোড়া পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আছে, ডানা দুটো দু'দিকে মেলা।

ঝট করে মনে পড়ে গেল নিমার! 'একই ট্রাক!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেও,

মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল। আতঙ্কের একটা ধাক্কা খেয়েছে বুকে। এই ট্রাকটাই ইয়র্কে ওর মায়ের ল্যান্ড রোভারকে ব্রিজ থেকে ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছিল। অসম্ভব, একই কোম্পানীর ট্রাক ইথিওপিয়ার দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় চলে আসাটা কাকতালীয় কোন ঘটনা হতে পারে না!

আরও কয়েক মাইল এগিয়ে খাদের খাড়া কিনারায় এসে থামল ওরা। নিচে নেমে রানার হাত ধরে টান দিল নিমা। 'কথা আছে,' ফিসফিস করল ও। নদীর ধারে চলে এল দু'জন।

পা ঝুলিয়ে একটা পাথরের ওপর পাশাপাশি বসল ওরা। পাশের ফুলে ওঠা নদী আভাস দিচ্ছে ওদের সামনে কি অপেক্ষা করছে। ঠাণ্ডা পাহাড়ী জলরাশি অসংখ্য পাথরের মাঝখান দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। ওদের নিচে পাহাড়-প্রাচীর পাথরের খাড়া দেয়াল, প্রায় এক হাজার ফুট গভীর। ওরা এত ওপরে রয়েছে যে সন্ধের আলো-ছায়া আর জলপ্রপাত থেকে ছড়িয়ে পড়া জলকণার ভেতর নিচের অন্ধকারও রহস্যময় লাগছে। নিচে তাকাতেই মাথাটা ঘুরে উঠল নিমার, নিজের অজান্তেই রানাকে আঁকড়ে ধরল। ধরার পর বুঝতে পারল কি করছে, তাড়াতাড়ি আবার ছেড়ে দিল। 'রানা, আপনার মনে আছে, ইয়র্কে একটা ট্রাক মামির ল্যান্ড রোভারকে ব্রিজ থেকে ফেলে দিয়েছিল?'

'কেন মনে থাকবে না!' নিমার দিকে তাকাল রানা। 'আপনাকে আপসেট লাগছে। কি ব্যাপার?'

'ট্রাকটার গায়ে কোম্পানীর নাম আর লোগো ছিল। নামটা আমি পড়তে পারিনি, তবে লোগোটা লক্ষ করেছিলাম। আজ বিকেলে ঠিক ওই একই ধরনের একটা ট্রাককে আমরা পাশ কাটিয়ে এসেছি। লোগো লাল একটা ঘোড়া। কোম্পানীর নাম প্রক্সি এক্সপ্লোরেশন।'

'আপনার ভুল হয়নি?'

'না!'

'একই কোম্পানীর ট্রাক ইয়র্কশায়ার আর গোজামে? মেনে নেয়া যায়?'

'কোম্পানী পুলিসের কাছে রিপোর্ট করে যে তাদের ট্রাক চুরি গেছে। এটা হয়তো তাদের সাজানো ব্যাপার, চুরি যাবার ঘটনা ঘটেনি, মিছিমিছি রিপোর্ট করেছে।'

'অসম্ভব নয়।'

'হাসলান চাচাকে খুন করার পরও আমার ওপর দু'বার হামলা করেছে ওরা,' বলল নিমা। 'বোঝাই যায়, বড় ধরনের আয়োজন করার ক্ষমতা রাখে তারা। মিশর আর ইংল্যান্ডে যারা আয়োজন করতে পারে, তাদের পক্ষে ইথিওপিয়ায়ও সেটা করা সম্ভব। আমাদের সমস্ত কাগজ-পত্র ও নোট তাদের দখলে রয়েছে, সে-সব দেখে তারা জেনেছে অ্যাবে নদীই তাদের গন্তব্য।'

হঠাৎ পাথর থেকে নেমে পড়ল রানা। 'আসুন।'

'কোথায়?' নিমা হতভম্ব।

'প্রক্সি বেস ক্যাম্পে। চলুন সাইট ফোরম্যানের সঙ্গে কথা বলি।'

ওদেরকে টয়োটায় উঠতে দেখে বাধা দেয়ার জন্যে ছুটে এল উস্তাভ। 'আমার

অনুমতি না নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?'

'চারদিকটা দেখতে,' বলে ক্লাচ ছেড়ে দিল রানা। 'এক ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসব।'

'কি বলে...না! আমার ট্রাক!' ধরার জন্যে ছুটছে উস্তাভ, কিন্তু টয়োটার গতি বেড়ে যাওয়ায় পিছিয়ে পড়ল সে।

'বিল করবেন।' রিয়ার-ভিউ মিররে তাকিয়ে হাসল রানা।

সাইনপোস্ট দেখে বাঁক ঘুরল ওরা, সাইড ট্র্যাক ধরে একটা রিজ পেরুল। চূড়ায় উঠে ব্রেক করল ও, সামনের দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাচ্ছে।

দশ একরের মত জায়গা পরিষ্কার ও সমতল করা হয়েছে। জায়গাটা কাঁটাতারের উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভেতরে ঢোকার একটা মাত্র গেট। সবুজ ও লাল রঙ করা তিনটে প্রকাণ্ড ডিজেল ট্রাক বেড়ার ভেতর পার্ক করা রয়েছে। ছোট আরও কয়েকটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, আর রয়েছে একটা লম্বা মোবাইল ড্রিলিং রিগ। উঠানের আরেক অংশ দখল করে রেখেছে প্রসপ্রেক্টিং ইকুইপমেন্ট। একদিকে স্তূপ করা হয়েছে ড্রিলিং রড আর ইস্পাতের কোর বক্স, স্পেয়ার পার্টস ভর্তি কাঠের বাক্স, ডিজেল ভর্তি চুয়াল্লিশ গ্যালনের কয়েকটা ড্রাম। এত সব জিনিস, অথচ তারপরও উঠানে প্রচুর জায়গা পড়ে আছে, এর কারণ প্রতিটি জিনিস সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে গুছিয়ে রাখা হয়েছে। গেটের ঠিক ভেতরে দশ-বারোটা ঘর, করোগেটেড শিট দিয়ে তৈরি। 'বড় একটা আউটফিট,' বলল রানা। 'নিজেদের কাজ বোঝে ওরা। চলুন দেখা যাক চার্জে কে আছে।'

গেটে দু'জন গার্ড, ইথিওপিয়ান আর্মির ক্যামোফ্লেজ ইউনিফর্ম পরা। অচেনা ল্যান্ড ক্রুজার দেখে বিস্মিত হয়েছে তারা। রানা হর্ন বাজাতে একজন এগিয়ে এল, সন্দেহে কুঁচকে আছে ভুরু, হাতে বাগিয়ে ধরা এ/কে ফরটিসেভেন রাইফেল।

'এখানকার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে চাই,' আরবীতে বলল রানা, বলার সুরে কর্কশ কর্তৃত্ব থাকল, সেন্ট্রিদের অনিশ্চিয়তা ও অস্বস্তির মধ্যে ফেলাটাই উদ্দেশ্য।

অপেক্ষা করতে বলে সঙ্গীর কাছে ফিরে পরামর্শ করল সেন্ট্রি, তারপর টু-ওয়ে রেডিওর হ্যান্ডসেট তুলে মাইক্রোফোনে কথা বলল। কথা বলার পর পাঁচ মিনিট পেরিয়েছে, কাছাকাছি একটা ঘরের দরজা খুলে একজন শ্বেতাঙ্গ বেরিয়ে এল।

তার পরনে খাকি কভারঅল, মাথায় নরম বুশ ক্যাপ। চোখ দুটো আয়না লাগানো সানগ্লাসে ঢাকা। শক্ত লেদারের মত গায়ের চামড়া, আকারে প্রকাণ্ড না হলেও শক্ত-সমর্থ, আস্তিন গুটানো হাতে পেশী ফুলে আছে। গার্ডের সঙ্গে দু'একটা কথা বলে টয়োটার দিকে এগিয়ে এল সে।

'কি চাই? কেন আসা হয়েছে?' কথার সুরে টেক্সাসের বাচনভঙ্গি স্পষ্ট, না ধরানো চুরুটটা দু'সারি দাঁতের মাঝখানে আটকে রেখেছে।

'আমি মাসুদ রানা।' ট্রাক থেকে নেমে এগিয়ে এল ও, হাত বাড়াল। 'হাউ ডু ইউ ডু?'

আমেরিকান লোকটা ইতস্তত করল, তারপর এমন ভঙ্গিতে হাতটা ধরল তাকে যেন একটা ইলেকট্রিক ঈল মোচড়াতে দেয়া হয়েছে। 'রাফেল,' বলল সে। 'জ্যাক রাফেল। আমিই এখানকার ফোরম্যান।' লোকটার হাতের সব ক'টা শিরা ফুলে আছে, শুকনো কয়েকটা ক্ষতচিহ্নও লক্ষ করল রানা। নখের ভেতর গ্রিজ, কালো হয়ে আছে।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। দেখুন না, হঠাৎ ট্রাকটা বেঁকে বসেছে। ভাবলাম এখানে যদি কোন মেকানিক পাই, দেখাব।' হাসল রানা, তবে বিনিময়ে লোকটা কোন রকম উৎসাহ দেখাল না।

'উটকো ঝামেলায় জড়ানো কোম্পানীর পলিসি নয়।' মাথা নাড়ল লোকটা।

'টাকা লাগলে দিতে রাজি আছি...।'

'একবার তো বললাম, না!' দাঁত থেকে চুরুট নামিয়ে মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে রাফেল।

'আপনাদের কোম্পানী-প্রক্সি। বলতে পারেন হেড অফিস কোথায়? ম্যানেজিং ডিরেক্টরের নাম কি?'

'আমি খুব ব্যস্ত মানুষ। আপনি আমার সময় নষ্ট করছেন।' ঘুরে দাঁড়াতে গেল রাফেল।

'শিকার করতে এসেছি, কয়েক হপ্তা এদিকে গুলি ছুঁড়ব। আমি চাই না ভুল করে আপনার কর্মচারীদের কারও গায়ে লাগুক। একটা ধারণা দিতে পারেন, কোনদিকে আপনারা কাজ করবেন?'

'এখানে আমি একটা প্রসপেক্টিং আউটফিট চালাচ্ছি, মিস্টার। গতিবিধি সম্পর্কে খবর ফাঁস করতে পারি না। যান!' ঘুরে সোজা নিজের অফিস-ঘরে চলে গেল রাফেল।

'ছাদে স্যাটেলাইট ডিস্ক,' মন্তব্য করল রানা। 'ভাবছি এই মুহূর্তে কার সঙ্গে কথা বলছে রাফেল।'

'টেক্সাসে কারও সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল নিমা।

'নট নেসেসারিলি,' বলল রানা। 'প্রক্সি নামকরা মাল্টিন্যাশনাল। রাফেল টেক্সান, তারমানে এই নয় যে তার বসও তাই হবে।' ইউ টার্ন নিল টয়োটা। 'প্রক্সির কুৎসিত কেউ যদি এই ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িত থাকে, আমার নামটা তার চেনা চেনা লাগবে। আমরা আমাদের হাজিরা নোটিশ দিয়েছি, দেখা যাক কি জবাব পাওয়া যায়।'

ডানডেরা নদী ও জলপ্রপাতের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল ইতিমধ্যে ক্যাম্প ফেলা হয়েছে, ওদের জন্যে চা বানাতে বসে গেছে শেফ। সন্ধের মধ্যে পুরো আধ বোতল ভদকা শেষ না করা পর্যন্ত মুখ হাঁড়ি করে থাকল উস্তাভ। তারপর সে জানাল, 'ঘোড়া আর গাধার বাচ্চা এখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করার কথা। এখানকার মানুষগুলোও তাই, খচ্চরঃ সময়ের কোন মূল্য দেয় না। ওরা না পৌঁছুলে খাদে আমরা নামতে পারব না।'

রানা খেয়াল করল, স্থানীয় লোকজনকে 'কালা কুত্তা' বলা থেকে বিরত

থাকছে উস্তাভ।

সকালে নাস্তা খাবার পরও যখন খচ্চরগুলো পৌঁছুল না, নিজের রাইফেলটা হাতে নিল রানা। ওর কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিয়ে পরীক্ষা করল উস্তাভ। 'মনে হচ্ছে পুরানো একটা রাইফেল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'উনিশশো ছাব্বিশ সালে তৈরি।'

'তখনকার লোকজন জানত কিভাবে রাইফেল বানাতে হয়?' প্রশংসা করল উস্তাভ। 'শর্ট মাউজার ওবানডর্ফ ডাবল স্কয়্যারব্রিজ অ্যাকশন, বিউটিফুল! তবে নতুন করে ব্যারেল লাগানো হয়েছে, ঠিক বলিনি?'

'অরিজিন্যাল ব্যারেল কেটে ফেলে দিয়েছি,' বলল রানা। 'নতুনটা লাগানোয় এখন আমি একশো কদম দূর থেকে একটা মশার ডানা উড়িয়ে দিতে পারি।'

'ক্যালিবার সেভেন ইনটু ফিফটিসেভেন, ঠিক?'

'টুসেভেনটিফাইভ রিগবি,' তার ভুলটা ধরিয়ে দিল রানা।

'একই কার্টিজ, আপনারা কায়দা করে অন্য নাম দিয়েছেন।' হাসছে উস্তাভ। 'একশো পঞ্চাশ গ্রেন বুলেট প্রতি সেকেন্ডে দু'হাজার আটশো ফুট গতি পাবে। সত্যি খুব ভাল রাইফেল, সেরাগুলোর মধ্যে একটা।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'আপনার প্রশংসার আমি মূল্য দিই।'

'কালা মানুষদের রসবোধ!'

টার্গেট প্র্যাকটিস করার জন্যে ক্যাম্প ত্যাগ করল রানা, ওর সঙ্গে নিমাও এল। নদীর তীরে এসে দুটো ক্যানভাস ব্যাগে সাদা বালি ভরল ওরা। একটা পাথরের ওপর ব্যাগ দুটো রাখা হলো, রাইফেলের রেস্ট হিসেবে কাজ করবে। ব্যাক-স্টপ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে খোলা হিলসাইড। দুশো গজ এগোল রানা, ওখানে একটা কার্ডবোর্ট কার্টুন সেট করল, তার ওপর টেপ দিয়ে আটকাল একটা বিসলে-টাইপ টার্গেট। পাথরটার পিছনে ফিরে এল আবার, এখানে নিমা আর রাইফেলটা অপেক্ষা করছে।

গুলির প্রথম আওয়াজটাই ঘাবড়ে দিল নিমাকে। রাইফেলটা দেখতে এত নিরীহ, তা থেকে এরকম বিকট আওয়াজ বেরুতে পারে, ভাবা যায় না। মনে হলো নিমার কানে যেন ভোঁ বাজছে। টার্গেটের তিন ইঞ্চি ডানে আর দু'ইঞ্চি নিচে লেগেছে বুলেট। টেলিস্কোপ সাইট অ্যাডজাস্ট করল রানা। পরবর্তী শট বুলসআইয়ের মাত্র এক ইঞ্চি ওপরে লাগল।

'আপনি নিরীহ প্রাণীগুলোকে এই ভয়ঙ্কর অস্ত্র দিয়ে মারবেন?' নিমার কথায় প্রতিবাদ ও আপত্তির সুর। 'এ কিন্তু উচিত নয়।'

'কেন, উচিত নয় কেন? ঈশ্বর তো ওগুলো আমাদেরকে দান করেছেন। আপনি তো বিশ্বাসী। উদ্ধৃতি শোনান আমাকে–অ্যাক্টস টেন, ভার্সেস টুয়েলভ অ্যান্ড থারটিন।'

'দুঃখিত,' মাথা নাড়ল নিমা। 'আপনি শোনান।'

'শুনুন–"...অল ম্যানার অব ফোরফুটেড বীস্টস্ অব দি আর্থ, অ্যান্ড ওয়াইল্ড বীস্ট, অ্যান্ড ক্রীপিং থিংস, অ্যান্ড ফাউলস অব দি এয়ার",' অনুরোধ রক্ষা করছে রানা, ' "অ্যান্ড দেয়ার কেম আ ভয়েস টু হিম, রাইজ, পিটার; কিল,

অ্যান্ড ঈট"।'

'আপনার উকিল হওয়া উচিত ছিল।' কৃত্রিম হতাশায় গুঙিয়ে মত উঠল নিমা।

আধ ঘন্টা পর কেসে ভরা রাইফেল নিয়ে ক্যাম্পে ফিরছে ওরা, কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'মেহমান!' বলে চোখে বিনকিউলার তুলল। 'বাহ্, নোটিশে তাহলে কাজ হয়েছে! ওখানে প্রক্সির একটা ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে, নিমা। চলুন দেখা যাক কি ঘটছে।'

ক্যাম্পের আরও কাছাকাছি এসে ওরা দেখল দশ কি বারোজন ইউনিফর্ম পরা সৈনিক লাল-সবুজ প্রক্সি ট্রাকের পাশে জড়ো হয়েছে, সবাই ভারী অস্ত্রে সজ্জিত। ডাইনিং তাঁবুর ফ্ল্যাপ তোলা, ভেতরে ক্যাম্প চেয়ার পেতে বসে রয়েছে জ্যাক রাফেল, একজন ইথিওপিয়ান আর্মি অফিসার ও উস্তাভ। গভীর আলোচনায় মগ্ন।

রানা ভেতরে ঢুকতেই চশমা পরা ইথিওপিয়ান আর্মি অফিসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল উস্তাভ। 'ইনি কর্নেল জুলিয়াস ঘুমা, সাউদার্ন গোজাম এলাকার মিলিটারি কমান্ডার।'

'হাউ ডু ইউ ডু?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কর্নেল কঠিন সুরে বলল, 'আপনার পাসপোর্ট আর ফায়ার আর্মসের লাইসেন্স দেখান।' তার চেহারা থমথম করছে। পাশে বসা জ্যাক রাফেলের চোখে নগ্ন উল্লাস, নিভে যাওয়া চুরুট চিবাচ্ছে।

নিজের তাঁবু থেকে কাগজ-পত্র নিয়ে এল রানা। টেবিলের ওপর সেগুলো মেলে ধরে বলল, 'আমি জানি, ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারির দেয়া আমার পরিচয়-পত্রটাও দেখতে চাইবেন আপনি। আর এটা হলো আদ্দিস আবাবা থেকে দেয়া ব্রিটিশ অ্যামব্যাসাডরের প্রশংসা-পত্র। আর এই যে, এটা দেখছেন, লন্ডনে ইথিওপিয়ার অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোক দিয়েছেন। আরেকটা, এটাই শেষ, দিয়েছেন আপনাদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জেনারেল সাইয়ি আব্রাহা।'

অলঙ্কৃত অফিশিয়াল লেটারহেড আর সরকারী সীল-ছাপ্পড়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল কর্নেল ঘুমা। সোনালি ফ্রেমের চশমার ভেতর তার চোখ দুটোয় প্রায় বিহ্বল দৃষ্টি। 'স্যার!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে স্যালুট করল। 'আপনি আগে বলেননি কেন? জেনারেল আব্রাহার বন্ধু আপনি? জানতাম না, আমি জানতাম না! কেউ আমাকে বলেনি। বিরক্ত করার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, স্যার!'

আবার স্যালুট করল সে, বিব্রত বোধ করায় আনাড়ি ও আড়ষ্ট লাগছে তাকে। 'আমি শুধু আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে প্রক্সি কোম্পানী এলাকায় ড্রিলিং ও ব্লাস্টিং অপারেশন চালাচ্ছে। বিপদ ঘটতে পারে। প্লীজ, সাবধান থাকবেন। তাছাড়া, এলাকায় অসংখ্য ডাকাত আর গুফতা আছে, সেদিক থেকেও সাবধান থাকতে হবে আপনাকে।' উত্তেজনায় হাঁপিয়ে গেছে সে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে। 'বুঝতেই পারছেন, প্রক্সি কোম্পানীর এমপ্লয়ীদের জন্যে এসকর্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি এখানে আমরা। যে-কোন রকম বিপদে আমাকে শুধু একটা খবর দিলেই হবে, আপনার সাহায্যে হাজির হয়ে যাব আমরা।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল।'

'আপনাকে আর বিরক্ত করব না, স্যার।' তৃতীয়বার স্যালুট করে প্রক্সি ট্রাকের দিকে পিছু হটছে কর্নেল, টেক্সান ফোরম্যানকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে। জ্যাক রাফেল এ পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি, কোনরকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে যাচ্ছে সে। ট্রাক চলতে শুরু করার পর ক্যাব জানালা থেকে চতুর্থ ও শেষ স্যালুটটা করল কর্নেল ঘুমা।

স্যালুটের উত্তরে অলসভঙ্গিতে একবার হাত নাড়ল রানা, নিমাকে বলল, 'সব মিলিয়ে বোঝা গেল, মি. প্রক্সি চান না এদিকে আমরা থাকি। সন্দেহ করছি শিগ্‌গির আবার তিনি সার্ভিস দিতে আসবেন।'

ডাইনিং টেবিলের কাছে ফিরে এসে উস্তাভকে রানা বলল, 'এখন শুধু আপনার খচ্চরগুলো এলেই হয়।'

'গ্রামে লোক পাঠিয়েছি। এসে পড়বে।'

খচ্চরগুলো পৌঁছুল পরদিন সকালে। ছ'টা শক্ত-সমর্থ জানোয়ার, প্রতিটির সঙ্গে খাকি শর্টস্ আর সাদা হাফশার্ট পরা একজন করে চালক। সকাল দশটার মধ্যে ওগুলোর পিঠে মাল-পত্র চাপিয়ে খাদে নামার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল ওরা। পথের শেষ মাথায় থামল উস্তাভ, গলা লম্বা করে ঢালের দিকে তাকাল। তার মত লোককেও অন্তত এই একবার খাদের সীমাহীন পতন ও দুরধিগম্য বিভীষিকা সন্ত্রস্ত ও নার্ভাস করে তুলল।

'আপনারা ভিন্ন এক জগতের ভিন্ন এক সময়ের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছেন,' প্রায় দার্শনিক ভঙ্গিতে বলল সে। 'ওরা বলে, ট্রেইলটা দু'হাজার বছরের পুরানো, যীশুর বয়েসী। ডেবরা মারিয়াম চার্চের কালো প্রিস্ট গল্প শোনায়, যীশু ক্রুশবিদ্ধ হবার পর ইসরায়েল থেকে পালাবার সময় ভার্জিন মেরী এই পথ ধরেই গিয়েছিলেন।' মাথা নাড়ল সে। 'তবে কথা হলো, এখানকার লোকেরা সত্যি-মিথ্যে সবই বিশ্বাস করে।' ট্রেইলে পা ফেলল সে।

পাহাড়-প্রাচীরকে জড়িয়ে আছে ওটা, নেমে গেছে এমন তির্যক ভঙ্গিতে, আর পাথরের ধাপগুলো পরস্পরের কাছ থেকে এত দূরে, যে প্রতিটি পদক্ষেপে হাঁটু ও পেটের শিরা পেশী ও চামড়ায় প্রবল চাপ পড়ে, ঝাঁকি খায় শিরদাঁড়া। ট্রেইলের পতন আরও বেশি খাড়া ও কর্কশ যেখানে, পাথর ধরে ঝুলে পড়তে হলো ওদেরকে, কিংবা ক্রল করে এগোতে হলো।

দেখে মনে হলো অসম্ভব ব্যাপার, ভারী বোঝা নিয়ে খচ্চরগুলো ওদেরকে অনুসরণ করতে পারবে না। ওগুলো যে কিরকম সাহসী, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। পাথরের এক ধাপ থেকে আরেক ধাপে লাফ দিল, পড়ার পর সামনের দুই পা ভাঁজ হয়ে গেল, পেশী শক্ত করে তৈরি হলো পরবর্তী ধাপে লাফ দেয়ার জন্যে। ট্রেইলটা এত সরু যে পেটমোটা বোঝা একদিকের পাথরের পাঁচিলে ঘষা খাচ্ছে, অপরদিকের সীমাহীন অধোগতি ফাঁক লোভীর মত হাঁ করে আছে।

ট্রেইল যখন বেঁকে গেছে, খচ্চরগুলো লাফ দিয়ে বাঁক নিতে পারছে না বা একবারের চেষ্টায় এগোতে পারছে না। পিছিয়ে এসে ট্রেইলটা স্পর্শ দিয়ে অনুভব

করতে হচ্ছে, পাঁচিলে গা ঘষে থেমে থেমে প্রতি বার একটু একটু করে এগোচ্ছে, ঘন ঘন দেখে নিচ্ছে খাদের কিনারা, আতঙ্কে ঘুরে গিয়ে বেরিয়ে আসছে চোখের সাদা অংশ। কর্কশ হুঙ্কার ছেড়ে, ওগুলোর গায়ে চাবুক মারছে চালকরা।

কোথাও কোথাও ট্রেইলটা পাহাড়ের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কয়েকবার ভেতরে ঢোকা অসম্ভব মনে হলো, সরু প্রবেশমুখের দু'পাশে সুচের মত ধারাল হয়ে আছে পাথর। কোথাও আবার মুখটা এতই সরু যে বোঝা সহ খচ্চর ভেতরে ঢুকতে পারবে না। অগত্যা পিঠ থেকে সব নামাতে হলো, খানিক দূর এগিয়ে তুলতে হবে আবার।

'দেখুন!' অবাক বিস্ময়ে চিৎকার দিল নিমা, হাত তুলে ফাঁকা দিকটা দেখাল। খাদের গভীরতা থেকে বিশাল ডানা মেলে উঠে এল কালো একটা শকুন, ভেসে গেল প্রায় ওদের দুই হাত দূর দিয়ে, লালচে নগ্ন মাথা ঘুরিয়ে কালো চোখে তাকাল ওদের দিকে।

পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে জড়িয়ে থাকা ট্র্যাক ধরে সারাদিন এগোল ওরা, বিকেল শেষ হয়ে আসছে অথচ এখনও অর্ধেক দূরত্বও পেরোয়নি। আরও একবার পুরোপুরি উল্টোদিকে ঘুরে গেল ট্রেইল, সামনে থেকে ভেসে এল জলপ্রপাতের গর্জন। প্রকাণ্ড একটা ঝুল-পাথরের দিকে এগোচ্ছে ওরা, আওয়াজটা সেই সঙ্গে বাড়ছে। কোণ ঘুরে ওটাকে পেরিয়ে আসতেই বিপুল জলরাশির পতন পুরোপুরি দৃষ্টিসীমার ভেতর চলে এল।

প্রবল বর্ষণে ঝড়ের মত গতি পেয়ে গেছে বাতাস, মনে হলো ওদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে; পাহাড়-প্রাচীরের গর্তের কিনারা আঁকড়ে ধরে কোন রকমে ঝুলে থাকতে হলো। ওদের চারদিকে রাশি রাশি জলকণা বিস্ফোরণের মত ছড়িয়ে পড়ছে, ভিজিয়ে দিচ্ছে উঁচু করা মুখ, কিন্তু ইথিওপিয়ান গাইড থামার সুযোগ না দিয়ে সোজা এগিয়ে নিয়ে চলল। এক সময় মনে হলো বর্ষণের তোড়ে উপত্যকায় ভেসে যাবে ওরা, এখনও কয়েকশো ফুট নিচে সেটা।

তারপর, যেন মন্ত্রবলে, ভাগ হয়ে গেল বিপুল জলরাশি, স্বচ্ছ নিবিড় পতনশীল পর্দার পিছনে পা ফেলে ঢুকে পড়ল শ্যাওলা ঢাকা ও ভেজা চকচকে পাথরের গভীর ফোকরে–হাজার বছর ধরে পানির তোড়ে পাহাড়-প্রাচীর ক্ষয়ে যাওয়ায় তৈরি হয়েছে। গাঢ় ছায়াময় এই জায়গায় আলো আসছে শুধু জলপ্রপাত ভেদ করে, তার রঙ সবুজাভ, ফলে গা ছমছমে রহস্যময় একটা আবহ তৈরি হয়েছে, ওরা যেন সাগরের তলায় একটা গুহার ভেতর রয়েছে।

'আজ রাতে এখানে আমরা ঘুমাব,' জানাল উস্তাভ, ওদের বিস্ময় উপভোগ করছে সে। গুহার পিছনে জ্বালানি কাঠের বান্ডিলগুলো ইঙ্গিতে দেখাল, পাশেই পাথরের তৈরি ফায়ারপ্লেস, ওপরের দেয়াল ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে আছে। 'খচ্চরের পিঠে চাপিয়ে মঠ সন্ন্যাসীদের জন্যে খাবার নিয়ে যায় গ্রামবাসীরা, এই জায়গা তারা কয়েকশো বছর ধরে ব্যবহার করছে।'

গুহার আরও ভেতরে চলে আসায় জলপ্রপাতের শব্দ ক্রমশ ভোঁতা হয়ে এল, পায়ের নিচে এখন শুকনো পাথর। চাকররা আগুন জ্বালার পর রোমান্টিক যদি না-ও হয়, আরামদায়ক আশ্রয় হয়ে উঠল জায়গাটা। এক কোণে স্লীপিং ব্যাগের

ভাঁজ খুলল রানা, স্বভাবতই ওর পাশে নিমাও। দু'জনেই খুব ক্লান্ত, স্লীপিং ব্যাগের ভেতর লম্বা হয়ে পেশীতে ঢিল দেয়ার চেষ্টা করল, গুহার ছাদে লাল-গোলাপি প্রতিফলন দেখছে।

'ভাবুন একবার!' ফিসফিস করল নিমা। 'কাল আমরা স্বয়ং টাইটার পায়ের ছাপে পা ফেলব।'

'ভার্জিন মেরীর কথা না হয় বাদই দিলাম।' হাসল রানা।

'আপনি অসহ্যরকম বিশ্বনিন্দুক,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিমা। 'আমার আরও ধারণা, আপনার নাক ডাকে।' তর্কযুদ্ধ জমল না, একটু পরই ঘুমিয়ে পড়ল ও।

ভোর হবার আগেই নড়াচড়া শুরু করল খচ্চর চালকরা। পায়ের সামনেটা দেখা যায়, এরকম আলো ফুটতেই আবার ওরা রওনা হলো। পাহাড়-প্রাচীরের ওপরের অংশে সকালের প্রথম রোদ লাগল যখন, তখনও ওরা উপত্যকার মেঝে থেকে এত উঁচুতে রয়েছে যে নিচের গোটা এলাকার ওপর চোখ বুলানো সম্ভব হলো। নিমাকে কাছে টেনে নিল রানা, বাকি ক্যারাভানকে থাকতে দিল ওদের সামনে। বসার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে প্যাঁচানো স্যাটেলাইট ফটোগ্রাফ খুলল ও। নিচের দৃশ্য থেকে প্রধান প্রধান চূড়া আর বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করল ওরা, ফলে মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া গেল কোথায় ওরা রয়েছে। 'এখান থেকে অ্যাবে নদী আমরা দেখতে পাব না,' বলল রানা। 'সেটা এখনও উপ-খাদের গভীরে লুকিয়ে আছে। দেখতে পাব সম্ভবত সরাসরি ওটার ওপরে পৌঁছুবার পর।'

'যেখানে আছি বলে হিসাব করলাম তাতে যদি ভুল না হয়, একজোড়া হাঁসুলিবাঁক ঘোরার পরই নদীটা দেখতে পাবার কথা–সম্ভবত ওই খাড়া পাঁচিলটার ওদিকেই বাঁক দুটো পাওয়া যাবে।'

'বোধহয়,' সায় দিল রানা। 'আর ডানডেরা নদী অ্যাবের সঙ্গে মিলিত হয়েছে ওদিকের ওই পাঁচিলগুলোর নিচে।' বুড়ো আঙুলের গিঁট ব্যবহার করল আনুমানিক দূরত্ব মাপার জন্যে। 'এখান থেকে প্রায় পনেরো মাইল।'

'দেখে মনে হচ্ছে হাজার বছরের মধ্যে কয়েকবারই গতিপথ বদল করেছে ডানডেরা। আমি অন্তত দুটো নালার আভাস পাচ্ছি, দেখতে প্রাচীন রিভার বেডের মত।' হাত তুলে দেখাল নিমা। 'ওখানে, আর ওদিকে। এখন অবশ্য জঙ্গলে ঢাকা পড়ে গেছে।' নিচে আরেকবার চোখ বুলিয়ে দম আটকাল ও। 'কি বিশাল এলাকা! আর কি জটিল! এই দুর্গম পাথরের জঙ্গলে লুকিয়ে থাকা সমাধির প্রবেশপথ কিভাবে খুঁজে পাব আমরা?'

'সমাধি? কোন সমাধির কথা বলা হচ্ছে?' পিছন থেকে সাগ্রহে জানতে চাইল উস্তাভ। ওদের খোঁজে ট্রেইল ধরে পিছিয়ে এসেছে সে। তার পায়ের আওয়াজ ওরা শুনতে পায়নি। 'কি, চুপ হয়ে গেলেন কেন? কার সমাধি খুঁজছেন আপনারা?'

'কার আবার,' নিরুদ্বিগ্ন রানার ঠোঁটে হাসি লেগে থাকল, 'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের সমাধি।'

'মঠটা না সেন্টের নামে উৎসর্গিত?' ফটোগ্রাফ পেঁচিয়ে রাখার সময় উস্তাভের দিকে ফিরে নিমাও হাসল।

'হ্যাঁ।' হতাশ দেখাল উস্তাভকে, যেন আরও ইন্টারেস্টিং কিছু শুনবে বলে আশা করেছিল। 'হ্যাঁ, সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস। তবে ওরা আপনাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। সন্ন্যাসীরা ছাড়া ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই কারও।' ক্যাপ নামিয়ে মাথা চুলকাল সে, তার চুল তারের মত, নখের ঘষায় প্রায় ধাতব শব্দ উঠছে। 'এ হপ্তায় তিমকাত উৎসব হবে। আনন্দ-উত্তেজনার বন্যা বয়ে যাবে ওখানে। বাইরে থেকে দেখে মজা পেতে হবে, ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।'

চোখ কুঁচকে সূর্যের দিকে তাকাল সে। 'চলুন যাওয়া যাক। দেখে মনে হচ্ছে কাছে, কিন্তু অ্যাবেতে পৌঁছুতে আরও দু'দিন লেগে যাবে আমাদের। নিচে আরও কঠিন পথ, এমন কি ডিক-ডিক শিকারীর জন্যেও।' নিজের কৌতুকে হেসে উঠে ঘুরে দাঁড়াল সে, ট্রেইল ধরে এগোল।

পাহাড়-প্রাচীরের যতই নিচে নামছে ওরা ট্রেইল ততই মসৃণ হয়ে উঠছে, ধাপগুলো আগের চেয়ে অগভীর, পরস্পরের সঙ্গে দূরত্বও বাড়ছে। সহজে এগোনো যাচ্ছে, তাই গতিও বেড়ে গেল। তবে বাতাসের মান ও স্বাদ বদলে গেছে। পাহাড়ী ঠাণ্ডা বাতাস উধাও হয়েছে, তার বদলে স্থান দখল করেছে শক্তিহীন নিস্তেজ বাতাস, তাতে সীমা না মানা জঙ্গলের স্বাদ ও গন্ধ লেগে আছে।

'গরম!' বলে উলেন শালটা গা থেকে খুলে ফেলল নিমা।

'দশ ডিগ্রী বেশি,' আন্দাজ করল রানা। পুরানো আর্মি জার্সিটা মাথা গলিয়ে খুলে আনল, এলোমেলো হয়ে থাকল এক রাশ কালো চুল। 'নিচে আরও গরম লাগবে। অ্যাবেতে পৌঁছুবার আগে আরও তিন হাজার ফুট নামতে হবে।'

এরপর বেশ খানিকদূর ডানডেরা নদী ঘেঁষে এগিয়েছে ট্রেইল। মাঝে মধ্যে দেখা গেল নদীটা থেকে কয়েক শো ফুট ওপরে রয়েছে ওরা, আবার খানিক পরই নেমে আসতে হলো কোমর সমান পানিতে, তীব্র স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যাবার ভয়ে খচ্চরের পিঠে চাপানো বোঝা আঁকড়ে ধরে আছে।

তারপর ডানডেরা নদীর খাদ এত গভীর আর খাড়া হয়ে উঠল যে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, পাহাড়-প্রাচীর সটান দাঁড়িয়ে আছে পানির ওপর। কাজেই নদী ছেড়ে আঁকাবাঁকা ট্র্যাক ধরল ওরা, ভাঙাচোরা পাহাড় আর লাল পাথুরে ব্লাফের মাঝখান দিয়ে এগিয়েছে।

ভাটির দিকে এক কি দু'মাইল এগোবার পর আবার ওরা অন্য এক মেজাজের ডানডোরার সঙ্গে মিলিত হলো, নদী এখানে ঘন ও নিবিড় বন ভূমির ভেতর দিয়ে কলকল শব্দে ছুটে চলেছে। লতানো গাছের ডগা পানি ছুঁয়ে আছে, ওদের মাথায় গাছের শ্যাওলা লেগে গেল। ওদেরকে দেখে ডালে ডালে খুব লাফালাফি আর চেঁচামেচি করছে কয়েক ঝাঁক বাঁদর। একবার নিচের ঝোপ ভেঙেচুরে ছুটল বড় আকৃতির একটা জানোয়ার। ঝট করে উস্তাভের দিকে তাকাল রানা।

মাথা নাড়ল রুশ গাইড, হাসছে। 'না, ডিক-ডিক নয়। কুডু।'

সারাটা দিন আঁকাবাঁকা ট্রেইল ধরে এগোল ওরা, শেষ বিকেলে ক্যাম্প ফেলল নদীর খানিকটা ওপরে, ফাঁকা একটা জায়গায়। এখানে আগেও অনেকবার ক্যাম্প ফেলা হয়েছে, লক্ষণ দেখে বোঝা গেল। ট্রেইল যেন এখানে দুই সময়শাসিত পর্যায়ে বিভক্ত–জলপ্রপাতের মাথা থেকে মঠে নামতে ট্যুরিস্টদের

পুরো তিন দিন লাগে, সবাই তারা এই একই জায়গায় ক্যাম্প ফেলে।

'দুঃখিত, এখানে কোন শাওয়ার নেই,' মক্কেলদের জানাল উস্তাভ। 'হাত-মুখ ধুতে চাইলে উজানের দিকে প্রথম বাঁক ঘুরলে নিরাপদ একটা পুল আছে।'

নিমার চোখে আবেদন, 'রানা, ঘামে একদম ভিজে গেছি। এমন কোথাও পাহারা দেবেন, ডাকলে যাতে শুনতে পান?'

বাঁকটার ঠিক নিচেই শ্যাওলা ঢাকা তীরে শুয়ে থাকল রানা; কাছাকাছি, তবে দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে ভেসে আসা নিমার পানি ছিটানো আর মৃদু হাসির শব্দ শুনছে। একবার মাথা ঘোরাবার পর উপলব্ধি করল স্রোত নিশ্চয়ই নিমাকে ভাটির দিকে টেনে নিয়ে এসেছে, কারণ গাছপালার ফাঁকে এক পলকের জন্যে নগ্ন পিঠ দেখা গেল, তারপর নিতম্বের ভাঁজ–মাখনের মত, ভেজা ও চকচকে। অপরাধবোধ জাগায় তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাল রানা।

খানিক পর ভাটির দিক থেকে তীর ধরে এগিয়ে আসতে দেখা গেল নিমাকে, কোমল সুরে গুন গুন করছে, চুলের পানি মুছছে তোয়ালে দিয়ে। 'আপনার পালা, রানা। চান আমি পাহারায় থাকি?'

'আমি এখন বড় হয়েছি।' মাথা নাড়ল রানা, তবে নিমা পাশ কাটানোর সময় তার চোখে রক্তিম লজ্জা আর সেই সঙ্গে কৌতুকের ক্ষীণ ঝিলিক দেখতে পেল। হঠাৎ রানা ভাবল, নিমা কি জানে স্রোতের টানে কতটা ভাটির দিকে চলে এসেছিল সে, তার কতটুকু দেখে ফেলেছে ও? চিন্তাটা রোমাঞ্চিত করে তুলল ওকে।

গোসল করার জন্যে উজানে চলে এল রানা। কাপড় খোলার সময় উপলব্ধি করল নিমা ওকে কতটা উত্তেজিত করে তুলেছে। 'ঠাণ্ডা পানি উপকারে আসবে,' বিড়বিড় করল ও, তারপর ডাইভ দিল নদীতে।

সন্ধ্যার পরপরই খাওয়াদাওয়া শেষ করে ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে আছে ওরা, হঠাৎ মুখ তুলে কান পাতল রানা। 'কিসের একটা আওয়াজ হচ্ছে না?'

'ঠিক ধরেছেন,' হেসে উঠে বলল রুবি। 'আপনি গান শুনতে পাচ্ছেন। আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে মঠের পুরোহিতরা আসছেন।'

ঠিক তখনই আগুনের লাল শিখা দেখতে পেল ওরা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ ধরে উঠে আসছে মশালমিছিল, গাছ-পালার ভেতর দিয়ে ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে আসায় মিটমিট করছে আলোগুলো। খচ্চর চালক আর চাকরবাকররা ভিড় করে সামনে বাড়ল, ছন্দোবদ্ধ গানের সঙ্গে তালি দিচ্ছে, স্বাগত জানাচ্ছে সম্মানীয় মঠ প্রতিনিধিদের।

ভারি ও গভীর পুরুষকণ্ঠ ক্রমশ চড়ছে, তারপর আবার ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অস্পষ্ট ফিসফিসানি, তবে বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই আবার চড়ছে, এভাবে বারবার। গানের কথাগুলো বোঝা গেল না, তবে সম্মিলিত কণ্ঠের প্রলম্বিত সুর হৃদয়কে দোলা দিয়ে যায়, আপনা থেকে ভক্তির একটা ভাব চলে আসে মনে। রানার শরীর শিরশির করে উঠল, হিম রোমাঞ্চ নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে।

তারপর দেখা গেল পুরোহিতদের সাদা আলখেল্লা, মশালের আলোয়

দেওয়ালি পোকার মত লাগছে, উঠে আসছে ট্রেইল ধরে। ক্যাম্পের সামনে খোলা জায়গায় সাধুদের দেখামাত্র ক্যাম্প সার্ভেন্টরা জমিনে হাঁটু গাড়ল। সামনের সারিতে রয়েছে অধস্তন তরুণ উপাসকরা, খালি পায়ে ও খালি মাথায়। তাদের পিছু নিয়ে এলেন সন্ন্যাসীরা, পরনে দীর্ঘ আলখেল্লা ও লম্বা পাগড়ী। কয়েক সারিতে এলেন তাঁরা, তবে দু'পাশে সরে গিয়ে পিছনটা ফাঁক করে দিলেন। সন্ন্যাসীরা আসলে এই মুহূর্তে মর্যাদাপূর্ণ প্রহরীর ভূমিকা পালন করছেন, তাঁদের ঠিক পিছনেই রয়েছেন নকশাদার আলখেল্লা ও অলঙ্কার পরিহিত যাজক বা পুরোহিতরা।

তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে ভারী কপটিক ক্রস, বসানো হয়েছে রুপোয় মোড়া একটা দণ্ডের মাথায়। পুরহিতদের সারিটাও দু'পাশে সরে গেল, আবেগমথিত সুরে এখনও তাঁরা গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করছেন, সরে গিয়ে চাঁদোয়া ঢাকা পালকিটাকে সামনে এগোবার পথ করে দিলেন। চারজন তরুণ উপাসক বয়ে নিয়ে এল সেটা, নামিয়ে রাখল ক্যাম্পের ঠিক মাঝখানে। মশাল ও ক্যাম্প লণ্ঠনের আলোয় লাল আর হলুদ সিল্ক পর্দা ঝলমল করছে।

'মোহন্তকে অভ্যর্থনা জানাতে সামনে এগোতে হবে,' ফিসফিস করল উস্তাভ। 'তাঁর নাম ওলি জারকাস।' পালকির কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা, নাটকীয় ভঙ্গিতে পর্দা সরিয়ে দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি মাটিতে পা রাখলেন।

নিমা ও রুবি সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে জমিনে হাঁটু গাড়ল, হাতজোড় করল বুকে। তবে রানা ও উস্তাভ নড়ল না। রানা বেশ আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে মোহন্ত বা প্রধান পুরোহিতের দিকে।

ওলি জারকাস কঙ্কাল বললেই হয়। তাঁর আলখেল্লা ঢোলা হলেও তেমন লম্বা নয়, হাঁটুর নিচে পা পাটখড়ির মত সরু ও কালো, মোচড় খাওয়া পেশী ফুলে আছে, হাড়ের ওপর ফুটে আছে আঁকাবাঁকা শিরা। আলখেল্লাটা সবুজ ও সোনালি, তার ওপর সোনার তৈরি সুতো দিয়ে নকশা করা হয়েছে, চকচক করছে আগুনের আভায়। মাথায় লম্বা হ্যাট, চূড়াটা সমতল, গায়ে এমব্রয়ডারি করা নক্ষত্র ও ক্রস চিহ্ন।

মোহন্তের মুখ গাছের শুকনো শিকড়ের সমষ্টি বলে মনে হবে, অসংখ্য ভাঁজ আর বলিরেখা কালের ছাপ ফেলেছে। কুঞ্চিত ও ফাটা ঠোঁটের ভেতর এখনও কয়েকটা দাঁত অবশিষ্ট আছে, প্রত্যেকটি ভাঙাচোরা ও হলুদ। রুপালি-সাদা দাড়ি, চোয়ালে যেন সাগর তীরের ফেনা জমে আছে। একটা চোখ ট্রপিকাল অপথ্যালমিয়ায় আক্রান্ত, অস্বচ্ছ নীল, সম্ভবত কিছুই দেখতে পান না; তবে অপর চোখ শিকারী চিতার মতই তীক্ষ্ণ ও চকচকে।

চড়া, কাঁপা কাঁপা গলায় কথা বললেন তিনি। 'আশীর্বাদ দিই, বাছাদের মঙ্গল হোক!' কনুই দিয়ে রানাকে গুঁতো মারল উস্তাভ, দু'জনেই ওরা সামান্য মাথা নত করল। প্রধান পুরোহিত সুর করে গান করছেন বা মন্ত্র আওড়াচ্ছেন, তিনি থামলেই কোরাস ধরছে সমবেত পুরোহিতরা।

আশীর্বাদ পর্ব শেষ হতে একে একে চারদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাতাসে ক্রসচিহ্ন

আঁকলেন মোহন্ত, এ সময় চারজন কিশোর চারটে রূপোর ধূপদানি ঘোরাতে শুরু করল দ্রুতবেগে, সবগুলো থেকে ধূপ-ধুনার ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

এরপর মেয়ে দুজন মোহন্তের সামনে এসে হাঁটু গাড়ল। ওদের দিকে ঝুঁকলেন তিনি, রূপোর ক্রস দিয়ে হালকাভাবে প্রত্যেকের গাল স্পর্শ করলেন, সুর করে আওড়ালেন বিশেষ আশীর্বাদ।

ফিসফিস করল উস্তাভ, 'লোকে বলে এঁর বয়েস একশো দশ বা তারও বেশি।'

সাদা আলখেল্লা পরা দু'জন তরুণ উপাসক আফ্রিকান কালো আবলুস কাঠের তৈরি একটা টুল বয়ে নিয়ে এল, ডিজাইনটা এত সুন্দর যে লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। ধারণা করল, সম্ভবত কয়েক শতাব্দী ধরে মঠপ্রধানরা ওটা ব্যবহার করছেন। উপাসক দু'জন ওলি জারকাসের কনুই ধরল, ধীরে ধীরে যত্নের সঙ্গে বসিয়ে দিল তাঁকে টুলের ওপর। এরপর পুরোহিতবৃন্দ ও সাধু-সন্ন্যাসীরা ঘিরে বসল তাঁকে, তাদের কালো মুখ তাঁর দিকে উঁচু হয়ে আছে।

তাঁর পায়ের কাছে বসে আছে রুবি, স্বামীর কথা ইথিওপিয়ার অফিশিয়াল ভাষা অ্যামহ্যারিক-এ অনুবাদ করছে। 'আপনাকে আবার অভ্যর্থনা জানাবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি, হোলি ফাদার।'

বৃদ্ধ প্রধান পুরোহিত মাথা ঝাঁকালেন। উস্তাভ আবার বলল, 'আমি বিশিষ্ট এক ভদ্রলোককে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ভিজিট করাবার জন্যে নিয়ে এসেছি। উনি আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন।'

'এ কি!' প্রতিবাদ করল রানা, কিন্তু দেখা গেল সাধু-সন্ন্যাসী আর পুরোহিতবৃন্দ প্রত্যাশায় চকচকে চোখ নিয়ে ওর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। অগত্যা বাধ্য হয়ে ফিসফিস করে প্রশ্ন করতে হলো, 'এখন কি করতে হবে আমাকে?'

'বুঝতে পারছেন না, এতটা দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে কেন এসেছেন উনি?' শয়তানি হাসি ফুটল উস্তাভের ঠোঁটে, সে-ও ফিসফিস করছে। 'উপহার চান! টাকা!'

'মারিয়া থেরেসা ডলার?' জানতে চাইল রানা, ইথিওপিয়ার এই মুদ্রা কয়েক শতাব্দী ধরে চলছে।

'তা না হলেও ক্ষতি নেই। সময় বদলেছে, ওলি জারকাসকে এখন মার্কিন ডলার বা ব্রিটিশ পাউন্ড দিয়েও সন্তুষ্ট করা যায়।'

'কত?'

'আপনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাঁর উপত্যকায় শিকার করবেন। কমপক্ষে পাঁচ শো ডলার।'

ব্যাগ আছে খচ্চরের পিঠে, উঠে গিয়ে সেখান থেকে টাকা নিয়ে আসতে হলো রানাকে। ইতিমধ্যে হাত পেতেছেন পুরোহিতপ্রধান, তাতে নোটগুলো ধরিয়ে দিল ও।

হাসলেন মোহন্ত, ভাঙা ও হলুদ দাঁত বেরিয়ে পড়ল। তারপর তিনি কথা বললেন। অনুবাদ করল রুবি, 'সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ও তিমকাত উৎসবে স্বাগতম।

অ্যাবের তীরে আপনার শিকার অভিযান সফল হোক।'

সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য খসে পড়ল। নড়েচড়ে বসল সবাই, হাসাহাসি শুরু করল। মোহন্ত উস্তাভের দিকে তাকালেন, দৃষ্টিতে প্রত্যাশা। তাঁর কথা ভাষান্তর করল রুবি, 'প্রধান পুরোহিত বলছেন, এতটা পথ আসতে তাঁর গলা শুকিয়ে গেছে।'

'বুড়ো শয়তান ব্র্যান্ডি খেতে চাইছেন!' হাসছে উস্তাভ, হাঁক ছেড়ে ক্যাম্পবাটলারকে ডাকল। একটু পরই ব্র্যান্ডির একটা বোতল মোহন্তের সামনে ক্যাম্প টেবিলে রাখা হলো, তার পাশেই থাকল উস্তাভের ভদকা। পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল তারা। ব্র্যান্ডিতে কিছু মেশালেন না মোহন্ত, ঢোক গেলার পর সুস্থ চোখটা থেকে পানি বেরিয়ে এল। বোতলটা অর্ধেক খালি করার পর খসখসে গলায় একটা প্রশ্ন করলেন, নিমার দিকে তাকিয়ে।

রুবি বলল, 'আল নিমা, উনি আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন, ও আমার কন্যা, কে তুমি, কোত্থেকে এলে? মানবজাতির ত্রাণকর্তা যীশুর পথে কে তোমাকে নিয়ে এল?'

'আমি একজন মিশরীয়, প্রাচীন ধর্মে বিশ্বাসী,' জবাব দিল নিমা।

মাথা ঝাঁকাল মোহন্ত, পুরোহিতরাও সবাই প্রশংসাসূচক হাসি দিল। 'খ্রিস্টধর্মে সবাই আমরা ভাই-বোন, মিশরীয় ও ইথিওপিয়ানরা,' মোহন্ত ওকে বললেন। 'এমন কি কপটিক শব্দটাও গ্রীক ভাষায়-মিশরীয়। ষোলো শো বছরেরও বেশি দিন ধরে কায়রোর প্রধান গির্জার পুরোহিত ইথিওপিয়ার বিশপকে নিয়োগ দান করেছেন। উনিশ শো উনষাট ষালে সম্রাট হাইলে সেলাসি নিয়মটা বাতিল করেন। তবু আমরা সবাই যীশুর সত্যিকার পথ অনুসরণ করব। আপনাকে স্বাগতম, প্রিয় কন্যা।'

ব্র্যান্ডির বোতল দ্রুত খালি হয়ে গেল। ইঙ্গিতে সেটা উস্তাভকে দেখালেন মোহন্ত। উস্তাভ ইংরেজিতে বলল, 'শালার ব্যাটা এত জায়গা পাচ্ছে কোথায় যে শুধু ঢেলেই চলেছে?'

তার এই কথাও অনুবাদ করতে যাচ্ছিল রুবি, হঠাৎ খেয়াল হতে মাথাটা নিচু করে নিল সে। তারপর রানার দিকে মুখ তুলে বলল, 'মোহন্ত জানতে চাইছেন, উপত্যকায় কি শিকার করতে চাইছেন আপনি?'

নিজেকে শক্ত করল রানা, তারপর জবাব দিল সাবধানে। অবিশ্বাসে দীর্ঘ কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন প্রধান যাজক, খলখল করে হেসে উঠলেন তিনি। দেখাদেখি বাকি সবাইও হাসতে শুরু করল। 'ডিক-ডিক? আপনি ডিক-ডিক শিকার করতে এসেছেন? কিন্তু তাহলে মাংস পাবেন কোত্থেকে?'

পাহাড় চূড়ায় দাঁড়ানো ডোরাকাটা ডিক-ডিকের একটা ফটো নিয়ে এসে তাঁর সামনে ক্যাম্প টেবিলের ওপর রাখল রানা। 'এটা সাধারণ কোন ডিক-ডিক নয়। এটা একটা পবিত্র ডিক-ডিক।' ইঙ্গিতে রুবিকে অনুবাদ করতে বলল ও। 'গল্পটা বলছি আমি।'

ভাল একটা গল্প শোনার আশায় চুপ হয়ে গেল সবাই, এমন কি মোহন্তের

হাতের গ্লাসও মাঝপথে থেমে গেছে। ওটা তিনি দ্বিতীয় বোতল থেকে ভরেছেন।

'জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট খাদ্যের অভাবে মরুভূমিতে মারা যাচ্ছেন,' শুরু করল রানা। 'ত্রিশটা দিন ও ত্রিশটা রাত পেরিয়ে গেছে, এককণা খাবারও জোটেনি তাঁর।' সেইন্টের নাম শুনে বুকে ক্রসচিহ্ন আঁকল কয়েকজন পুরোহিত। 'শেষে প্রভু তাঁর ভৃত্যের প্রতি সদয় হলেন, ছোট একটা হরিণ আটকে দিলেন অ্যাকেইশা গাছের ডালে ও কাঁটায়। তারপর সেইন্টকে তিনি বললেন, "তোমার জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি, কাজেই তুমি মরবে না। এই মাংস নিয়ে খাও তুমি"। জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট যখন ছোট্ট প্রাণীটিকে স্পর্শ করলেন, ওটার পিঠে তাঁর আঙুলের ছাপ পড়ে গেল চিরকালের জন্যে।'

সবাই চুপ। এতই প্রভাবিত হয়েছে যে চোখের পাতা ফেলতেও ভুলে গেছে।

ফটোটা আরেকবার প্রধান পুরোহিতকে দেখাল রানা। 'দেখুন, সেইন্টের আঙুলের ছাপ আছে।'

ফটোটা সশ্রদ্ধভঙ্গিতে হাতে নিলেন ওলি জারকাস, ভাল চোখটার সামনে তুললেন। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর বিস্মিত গলায় বললেন, 'কথাটা সত্যি! সেইন্টের আঙুলের ছাপ পরিষ্কারই চেনা যায়!' ফটোটা তিনি পুরোহিতদের দেখার জন্যে দিলেন। প্রত্যেকে দেখলেন, এবং প্রধান পুরোহিতের মন্তব্য পুনরাবৃত্তি করলেন।

'আপনারা কেউ এই প্রাণীটিকে দেখেছেন কখনও?' উত্তরে এক এক করে সবাই মাথা নাড়লেন। পুরোহিতদের দেখা শেষ, এখন সেটা তরুণ উপাসকরা দেখছে।

হঠাৎ তাদের একজন তড়াক করে সিধে হলো, ফটো হাতে লাফাচ্ছে আর উত্তেজনায় চিৎকার করছে। 'আমি দেখেছি, দেখেছি আমি! যীশুর কিরে, পবিত্র এই প্রাণী দেখা দিয়েছে আমাকে!' খুবই কম বয়েস তার, কিশোরই বলতে হবে।

বাকি সবাই নিন্দা করছে তার, কেউ বিশ্বাস করতে রাজি নয়।

'মাথামোটা ছেলে, মাঝে মধ্যেই শয়তান ভর করে,' ম্লান সুরে বললেন ওলি জারকাস, দুঃখে কাতর দেখাল তাঁকে। 'ওর কথায় গুরুত্ব দেবেন না। বেচারা বাটি!'

ইতিমধ্যে বাটির হাত থেকে ফটোটা কেড়ে নেয়া হয়েছে। উপাসকদের হাতে হাতে ঘুরছে সেটা, আর ফিরে পাবার জন্যে ছুটোছুটি করছে সে। সবাই তার সঙ্গে কৌতুক করছে। কিন্তু বাটি সাংঘাতিক উত্তেজিত, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। বাধা দেয়ার জন্যে এগোল রানা, দুর্বলচিত্তের এক কিশোরকে নিয়ে এই খেলাটা নিষ্ঠুর মনে হলো ওর। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কিশোরের মনে কি ঘটল কে জানে, সটান পড়ে গেল সে জমিনের ওপর, যেন কেউ তার মাথায় মুগুরের বাড়ি মেরেছে। পিঠটা ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল, হাত-পা মোচড় ও ঝাঁকি খাচ্ছে, চোখের মণি উল্টে গিয়ে অদৃশ্য হলো খুলির ভেতর, শুধু সাদা অংশটুকু দেখা যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণ বেয়ে গড়িয়ে নামছে সাদা ফেনা।

তার কাছাকাছি রানা পৌঁছুবার আগেই চারজন উপাসক চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল তাকে। রাতের অন্ধকারে তাদের হাসির শব্দ মিলিয়ে গেল। বাকি

সবার আচরণ দেখে মনে হলো অস্বাভাবিক কিছু ঘটেনি। ওলি জারকাস ইঙ্গিতে একজন তরুণকে আবার গ্লাসটা ভরে দিতে বললেন।

ছয়

পরদিন সকালে আবার যখন রওনা হলো ওরা, ট্রেইলটা বেশ কিছুদূর নদীর পাড় ঘেঁষে থাকল। মাইলখানেক পর স্রোতের গতি খুব বেড়ে গেল, তারপর উঁচু ও লাল পাহাড়-প্রাচীরের মধ্যবর্তী সরু ফাঁকের ভেতর ঢুকে পড়ল, সেখান থেকে লাফ দিয়ে নিচে পড়ছে—অর্থাৎ এখানে আরেকটা জলপ্রপাত সৃষ্টি হয়েছে।

বহুল ব্যবহৃত ট্রেইল ছেড়ে জলপ্রপাতের কিনারায় এসে দাঁড়াল রানা। দুশো ফুট গভীরে পাথরের একটা ফাটলে তাকাল ও, আক্রোশে সংকুচিত ভয়াল প্রবাহকে কোন রকমে গলে বেরিয়ে যেতে দেয়ার মত চওড়া। ফাঁকটার ওপারে একটা পাথর ছুঁড়ে দিতে পারে রানা। নিচের ওই গহ্বরে কোন পথ বা পা ফেলার জায়গা নেই। ফিরে এসে ক্যারাভ্যানের সঙ্গে যোগ দিল ও, ঘুরপথ ধরে নদীর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, ঢুকে পড়েছে আরেকটা গভীর জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকায়।

'এটা বোধহয় এক সময় ডানডেরা নদীর কোর্স ছিল, ফাটলটার ভেতর নতুন পথ তৈরির আগে।' পথের দু'পাশে উঁচু জমিনের দিকে হাত তুলল নিমা, তারপর ইঙ্গিতে ট্রেইলের ওপর ছড়িয়ে থাকা মসৃণ বোল্ডারগুলো দেখাল।

'নদীর গতি পথ বারবার বদলে যাওয়ায় গোটা এলাকায় ক্ষয় আর কাটাছেঁড়ার প্রচুর নমুনা দেখতে পাবেন। নিশ্চিতভাবে ধরে নিতে পারেন, লাইমস্টোনের পাঁচিলগুলোয় গুহা আর ঝর্ণা গিজগিজ করছে।'

ট্রেইল এখন দ্রুত নীল নদের দিকে নামছে, শেষ কয়েক মাইলে প্রায় পনেরোশো ফুট নিচে চলে এসেছে ওরা। উপত্যকার সাইডগুলো গাছপালায় ঢাকা, বহু জায়গায় দেখা গেল লাইমস্টোনের গা থেকে খুদে ঝর্ণার পানি অলসভঙ্গিতে পুরানো নদীর তলায় পড়ছে।

নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে গরমও বাড়ছে। আজ খাকি শার্ট পরেছে নিমা, ঘামে ওর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানটা ভিজে গেছে।

এক জায়গায় দেখা গেল ঘন জঙ্গলে মোড়া পাহাড়ের অনেক উঁচু থেকে স্বচ্ছ পানি নেমে আসছে, স্রোতটা চওড়া হয়ে রীতিমত ছোট একটা নদী হয়ে উঠেছে। তারপর উপত্যকার একটা কোণ ঘুরল ওরা, দেখতে পেল ওদের সঙ্গে এখানে স্রোতটাও মিলিত হয়েছে ডানডেরা নদীর মূল প্রবাহে। খাদের পিছন দিকে তাকিয়ে পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে একটা অকৃত্রিম সরু খিলান দেখতে পেল ওরা, ফাটলের ভেতর দিয়ে ওই খিলান হয়ে বেরিয়ে এসেছে নদী। ফাটল ও খিলানের চারধারে পাথরের রঙ অদ্ভুত লালচে-গোলাপী, পালিশ করা মসৃণ, ভাঁজের ওপর

ভাঁজ খেয়ে আছে, ফলে রঙ ও আকৃতিতে মানুষের জোড়া ঠোঁটের মত দেখতে হয়েছে।

'যেন কোন দৈত্যের মুখ থেকে নর্দমা বেরিয়েছে,' ফিসফিস করল নিমা, তাকিয়ে আছে খিলান, ফাটল আর অদ্ভুতদর্শন পাথরের দিকে। 'ভাবছি টাইটা আর প্রিন্স মেমননের নেতৃত্বে প্রাচীন মিশরীয়রা এখানে যদি এসে থাকে, কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাদের। প্রকৃতির এই অদ্ভুত খেয়াল নিশ্চয়ই তাদেরকে খুব নাড়া দিয়েছিল।'

'তাদের রক্ত আপনার শিরাতেও বইছে,' বলল রানা। 'অবশ্যই তারাও আপনার মত মুগ্ধ হয়েছিল।'

রানার হাত ধরল নিমা। 'আপনি আমাকে ভরসা দিন, রানা। বলুন এখানে আমার উপস্থিতি স্বপ্নের ভেতর ঘটছে না। বলুন আমরা যা খুঁজতে এসেছি তা অবশ্যই পাব। আমাকে নিশ্চয়তা দিন, হত্যার প্রতিশোধ নিয়ে হাসলান চাচার আত্মাকে শান্তি দিতে পারব আমরা।'

রানার দিকে মুখ তুলে রেখেছে নিমা, উদ্ভাসিত মুখে চকচক করছে শিশির কণার মত ঘাম। ওকে আলিঙ্গন করার প্রবল একটা ঝোঁক চাপল, ইচ্ছে হলো ভেজা ও ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট জোড়ায় চুমো খায়। তার বদলে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ট্রেইল ধরে নেমে যাচ্ছে।

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই রানার, নিমার দিকে তাকাতে সাহস পাচ্ছে না। খানিক পর পিছনে শব্দ হলো, পিছু নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে নিমা। নিঃশব্দে নিচে নামছে ওরা, অন্যমনস্ক থাকায় ওদের সামনে অকস্মাৎ উন্মোচিত প্রাকৃতিক বিস্ময়ের জন্যে প্রস্তুত ছিল না রানা।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে উপ-খাদের অনেক ওপরে, একটা কার্নিসে। ওদের নিচে লাল পাথর ভর্তি বিশাল এক কড়াই, পাঁচশো ফুট গভীর। কিংবদন্তীর অ্যাবের মূল প্রবাহ সবুজ খরস্রোত, লাফ দিয়ে পড়ছে ছায়াময় অতল গহ্বরে। সেটা এত গভীর যে সূর্যের আলো নাগাল পায় না। ওদের পাশ থেকে ডানডেরা নদীর বিক্ষিপ্ত পানিও একই ভঙ্গিতে লাফ দিয়েছে, পানির পতনটা বকের সাদা পালকের মত লাগছে দেখতে, খাদের ভেতরকার বাতাসে মোচড় খাচ্ছে ও ফুলছে। অতল গহ্বরে মিলিত হচ্ছে দুই প্রবাহ, বিপুল জলরাশি টগবগ করে ফুটছে, বিশাল ঢেউগুলো চুরমার হয়ে ফেনা তৈরি করছে, অবশেষে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেয়ে সেদিকে ছুটে চলেছে অনিয়ন্ত্রিত প্রচণ্ড শক্তিতে।

'বোট নিয়ে আপনি ওখানে গিয়েছিলেন?' রানার দিকে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নিমা।

'কম বয়েসে কত রকম বোকামি করে মানুষ,' ক্ষীণ বিষণ্ন হাসি রানার ঠোঁটে, পুরানো স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়ায় হাতের রোম দাঁড়িয়ে গেল।

কিছুক্ষণ কেউ কথা বলল না। এক সময় মৃদু গলায় নিমা বলল, 'উজানের দিকে আসার সময় টাইটা আর মেমনন কি ধরনের বাধার সামনে পড়েছিল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।' নিজের চারদিকে তাকাল ও। তারপর খাদের নিচের অংশটা দেখাল, পশ্চিম দিকটা। 'ওদের পক্ষে অবশ্যই উপ-খাদ ধরে আসা সম্ভব

ছিল না। পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলো যে রেখা তৈরি করেছে, নিশ্চয়ই সেই রেখা ধরে আসে তারা–সরাসরি এখান পর্যন্ত, যেখানে এই মুহূর্তে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি।' চিন্তাটা ওর গলায় উত্তেজনার ভাব এনে দিল।

'জোর করে কিছুই বলা যায় না। তারা হয়তো নদীর ওপারে পৌঁছেছিল।'

রানা ঠাট্টা করে বললেও, নিমার চেহারা ঝুলে পড়ল। 'এটা তো ভাবিনি। হ্যাঁ, তা সম্ভব বৈকি। রানা, এপারে যদি কোন সূত্র না পাই, ওপারে আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

'যখনকার সমস্যা তখন দেখা যাবে।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল ওরা। যে কাজ নিয়ে এখানে আসা হয়েছে তার ব্যাপকতা ও বিশালত্ব কল্পনা করছে দু'জনেই, উপলব্ধি করছে অনিশ্চয়তার মাত্রা। খানিক পর নিমাই আবার নিস্তব্ধতা ভাঙল, 'রানা, মঠটা কোথায়? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'সরাসরি আমাদের পায়ের নিচে যে, দেখবেন কিভাবে।'

'ওখানে আমরা ক্যাম্প ফেলব?'

'সন্দেহ আছে। চলুন দেখি উস্তাভকে ধরি, দেখি সে কি ভাবছে।'

কড়াইয়ের কিনারা ধরে ট্রেইল অনুসরণ করল ওরা, খচ্চরগুলোকে ধরে ফেলল যেখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে ট্র্যাক। একটা পথ নদীর উল্টোদিক ধরে জঙ্গল ঢাকা নিচু জমিনে নেমে গেছে, অপরটা আগের মতই কিনারার পাথরে ঝুলে আছে। ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল উস্তাভ, হাত তুলে নিচু জমিনে নেমে যাওয়া ট্র্যাকটা দেখাল সে। 'ওদিকে জঙ্গলের ভেতর ভাল একটা ক্যাম্পসাইট আছে। শেষবার শিকার করতে এসে ওখানে ছিলাম আমরা।'

জঙ্গলে ঢুকে ফাঁকা একটা জায়গা পাওয়া গেল। কয়েকটা বুনো ডুমুর গাছ থাকায় ছায়ার অভাব নেই। এক কোণের ছোট্ট একটা ঝর্ণায় রয়েছে নির্মল পানি। বোঝা হালকা করার জন্যে তাঁবুগুলো খাদে বয়ে আনেনি উস্তাভ। খচ্চরের পিঠ থেকে মাল-পত্র নামানো শেষ হতেই নিজের লোকদের তিনটে ছোট কুঁড়েঘর বানাবার হুকুম দিল সে। ঝর্ণার কাছ থেকে যথেষ্ট দূরে একটা ল্যাট্রিনও তৈরি করা হবে।

এ-সব কাজ যখন চলছে, নিমা আর রুবিকে ডেকে নিল রানা, তিনজন রওনা হয়ে গেল মঠ দেখার জন্যে। দুই ট্র্যাকের মুখে এসে দাঁড়াল ওরা, তারপর রুবির নেতৃত্বে পাহাড়-প্রাচীরের কিনারা ঘেঁষা ট্রেইল ধরে এগোল। খানিক পরই চওড়া এক প্রস্থ পাথুরে সিঁড়ি পাওয়া গেল, পাহাড়-প্রাচীরের মুখ বেয়ে নিচে নেমে গেছে।

সাদা আলখেল্লা পরা একদল সন্ন্যাসী ধাপ বেয়ে উঠে আসছিল, অল্প কিছুক্ষণ থেমে তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল রুবি। তারা ওদেরকে পাশ কাটিয়ে উঠে যেতে সে বলল, 'তিমকাত উৎসবের আগের রাতটাকে কাটেরা বলা হয়। কাল উৎসব তো, আজ তাই সবাই খুব ব্যস্ত। তিমকাত খুব বড় ধর্মীয় উৎসব।'

'কিন্তু মিশরের চার্চ ক্যালেন্ডারে তো এ-ধরনের কোন উৎসবের উল্লেখ নেই,' বলল নিমা।

‘এটা আসলে ইথিওপিয়ান ইপিফানি, যীশুর ব্যাপ্টিজম উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়,’ ব্যাখ্যা করল রুবি। ‘উৎসব চলার সময় নদীতে গিয়ে কিছু ধর্মীয় আচার অনুশীলন করা হবে, সমস্ত পাপ ধুয়ে-মুছে পবিত্রকরণের পর ব্যাপ্টিজমে দীক্ষা দেয়া হবে তরুণ উপাসকদের, ঠিক যেভাবে ব্যাপ্টিস্টের হাতে দীক্ষা নিয়েছিলেন স্বয়ং যীশু।’

খাড়া পাহাড়-প্রাচীরের অবয়ব বেয়ে নেমে গেছে সিঁড়ির ধাপ, আবার ওরা সেটা ধরে নামতে শুরু করল। শত শত বছর ধরে নগ্ন পা ফেলায় প্রতিটি ধাপ মসৃণ ডিশ-এ পরিণত হয়েছে। ওদের কয়েকশো ফুট নিচে নীল নদ হিসহিস আওয়াজ তুলে টগবগ করে ফুটছে, চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে বিপুল জলকণা।

হঠাৎ করেই চওড়া একটা টেরেসে বেরিয়ে এল ওরা, কঠিন পাথর কেটে মানুষই এটা তৈরি করেছে। মাথার ওপর লাল পাথর ঝুলে আছে, তোরণশোভিত উদ্যানের ওপর ছাদ হিসেবে কাজ করছে; খিলান আকৃতির পাথরের তোরণগুলো প্রাচীন মিস্ত্রীরা ছাদের অবলম্বন হিসেবে তৈরি করেছিল। ঢাকা ও লম্বা টেরেসের ভেতরদিকের দেয়ালে অসংখ্য প্রবেশপথ, সামনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গেছে। যুগ যুগ ধরে পাহাড়-প্রাচীরের গা কেটে অসংখ্য হল, সেল, চেম্বার, চার্চ ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে। নির্জনতা প্রিয় সন্ন্যাসীরা এখানে বসবাস করছেন হাজার বছরেরও বেশি দিন ধরে।

টেরেসের দৈর্ঘ্য জুড়ে দলে দলে ভাগ হয়ে বসে আছেন সন্ন্যাসীরা। একদিকে কিছু সন্ন্যাসী যাজকের ধর্মশাস্ত্র পাঠ শুনছেন। বাগানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় আরেক দল সন্ন্যাসীকে দেখা গেল, সুর করে ধর্মীয় সঙ্গীত গাইছেন, অ্যামহ্যারিক ভাষায় লেখা। নানা গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। জ্বালানি কাঠ আর ধূপের ধোঁয়া তো আছেই, আরও আছে ঘাম, গরম নিঃশ্বাস, শোক, অসুস্থতার গন্ধ। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে বসে রয়েছে তীর্থে আসা সাধারণ মানুষ। দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে তারা, অনেককেই অসুস্থ আত্মীয়স্বজনকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। সেইন্টের কাছে অনেক কিছু চাওয়ার আছে তাদের। কেউ তার ভোগান্তির অবসান চায়, কেউ ফিরে পেতে চায় সুস্থতা, আবার কেউ এসেছে পাপের শাস্তি মউকুফ করার আবেদন নিয়ে।

মায়ের কোলে অনেক অন্ধ ছেলেকে দেখা গেল। হাড় থেকে মাংস খসে পড়ছে এমন কুষ্ঠরোগীর সংখ্যাও কম নয়। তাদের আহাজারি ও গোঙানির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে সন্ন্যাসীদের সুর করে গাওয়া প্রার্থনা সঙ্গীত, আরও মিশছে প্রকাণ্ড কড়াইয়ের নিচ থেকে ভেসে আসা নীলনদের ফোঁসফোঁসানি।

এক সময় ওরা সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস ক্যাথেড্রালের প্রবেশমুখে এসে পৌঁছুল। মাছের হাঁ করা মুখের মত গোল একটা ফাঁক, তবে দরজার চারদিকের গায়ে চওড়া বর্ডারের ওপর আঁকা হয়েছে নক্ষত্র, ক্রসচিহ্ন ও সেইন্টদের মাথা।

প্রবেশপথে সবুজ ভেলভেটের আলখেল্লা পরা একজন যাজক পাহারায় দাঁড়িয়ে আছেন। রুবি তাঁর সঙ্গে কথা বলার পর ভেতরে ঢোকার অনুমতি দিলেন তিনি। চওড়া হলেও, দরজাটা নিচু, ঢোকার সময় মাথা নিচু করতে হলো রানাকে। ভেতরে ঢোকার পর মাথা উঁচু করে চারদিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত হয়ে

গেল।

বিশাল গুহার ভেতর ছাদ এত ওপরে যে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। পাথুরে দেয়াল মিউরাল-এ ঢাকা, ডানা বিশিষ্ট পরী আর দেব-দেবীদের ছবি আঁকা হয়েছে, মোমবাতি আর ল্যাম্পের কাঁপা কাঁপা আলো পড়ায় যেন মনে হলো নড়াচড়া করছে। ছবিগুলো আংশিক ঢাকা পড়েছে পাঁচিলের ওপর কারুকাজ করা লম্বা ব্যানার বা পর্দা ঝুলে থাকায়, কিনারার ঝালর জট পাকিয়ে গেছে, ছিঁড়েও গেছে কোথাও কোথাও। এরকম একটা ব্যানারে সেইন্ট মাইকেলকে দেখা যাচ্ছে, সাদা একটা ঘোড়া ছোটাচ্ছেন তিনি। আরেকটায় দেখা গেল ক্রস-এর পাদদেশে হাঁটু গেড়ে রয়েছেন ভার্জিন, তাঁর ওপরে যীশুর ম্লান শরীর থেকে রক্ত ঝরে পড়ছে, পাঁজরে গাঁথা রোমান বর্শা।

চার্চের এটা বাইরের অংশ। দূর প্রান্তের দেয়ালে মিড্‌ল্ চেম্বারে ঢোকার দরজা। দরজা আসলে একজোড়া, খোলাই রয়েছে। পাথরের মেঝে ধরে হেঁটে এল ওরা তিনজন, হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত তীর্থযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে। সবাই তারা হয় গান গাইছে, নয়তো কান্নাকাটি করছে। অনেককেই দেখা গেল যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ধূপ-ধুনোর নীলচে ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা।

তিনটে ধাপ পেরিয়ে ভেতরের দরজাগুলোর সামনে পৌঁছুতে হয়, কিন্তু সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন আলখেল্লা পরা দু'জন দীর্ঘদেহী যাজক, মাথায় লম্বা হ্যাট, হ্যাটের মাথা সমতল। তাঁদের একজন রাগের সঙ্গে কি যেন বললেন রুবিকে।

‘ওঁরা এমন কি মিডল চেম্বারেও ঢুকতে দেবেন না,’ জানাল রুবি। ‘ওই চেম্বারের সামনে মাকডাস–হোলি অব হোলিস।’

উঁকি দিয়ে প্রহরী যাজকদের পিছনে তাকাল ওরা, মিডল চেম্বারের ভেতর দিয়ে প্রবেশনিষিদ্ধ পবিত্র স্থানটার দরজাই শুধু দেখা গেল। ‘মাকডাসে শুধু ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতরা ঢুকতে পারেন, কারণ ওখানে ট্যাবট আছে, আর আছে সেইন্টের সমাধিতে ঢোকার দরজা।’

তারা ভরা আকাশের নিচে বসে রাতের খাবার খেলো ওরা। বাতাসে এখনও দম আটকানো গরম। নাগালের ঠিক বাইরে মেঘের মত ঝুলে আছে ঝাঁক ঝাঁক মশা। কাপড়ের বাইরে চামড়ায় রিপেলেন্ট মেখেছে ওরা, তা না হলে রক্ষা ছিল না।

‘এবার বলুন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। যেখানে আসতে চেয়েছিলেন সেখানে আপনাকে আমি পৌঁছে দিয়েছি। অত দূর থেকে যে প্রাণীর সন্ধানে এলেন, বলুন সেটা কোথায় খুঁজবেন।’

‘ভোরে ট্র্যাকারদের ভাটির দিকে পাঠাবেন,’ জবাব দিল রানা। ‘সব ডিক-ডিকের পায়ের ছাপ একই রকম বলে আমার ধারণা। ছাপ চোখে পড়লে কাছাকাছি লুকিয়ে থাকতে হবে। ডিক-ডিক নিজেদের এলাকা ছেড়ে কোথাও যায় না। অপেক্ষা করলে দেখতে পাবে। আর দেখতে পেলে আমাকে খবর দেবে।’

‘ঠিক আছে, ট্র্যাকারদের পাঠালাম। কিন্তু আপনি কি করবেন? মেয়েদের নিয়ে ক্যাম্পে থাকবেন?’ তির্যক দৃষ্টি হেনে হাসল উস্তাভ। ‘মেয়েরা আপনার সেবা-যত্ন করলে আমার কোন আপত্তি নেই।’

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়াল রুবি, রান্নাবান্নার তদারক করার কথা বলে কিচেনের দিকে চলে গেল। উস্তাভের ইঙ্গিতটা গায়ে মাখল না রানা, বলল, 'ডানডেরার পাশে ঝোপের ভেতর কাজ করব আমরা। ওদিকে ডিক-ডিক থাকতে পারে। আপনার লোকদের নদীর ওদিকে যেতে নিষেধ করে দেবেন। আমি চাই না শিকারের সময় কেউ ডিসটার্ব করুক।'

পরদিন ভোরের আলো ভাল করে ফোটার আগেই ক্যাম্প ত্যাগ করল ওরা, সঙ্গে রাইফেল ও হালকা খাবার নিয়েছে। ডানডেরার পাশে এসে ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটছে রানা, পিছনে নিমা। কয়েক পা এগিয়ে একবার করে থামল, কান পেতে শুনছে। ডালে ডালে প্রচুর পাখি, ঝোপের ভেতর খুদে প্রাণীদের সংখ্যাও কম নয়। 'ইথিওপিয়ানরা শিকারে খুব একটা অভ্যস্ত নয়,' বলল রানা। 'আর খাদের ভেতর সন্ন্যাসীরাও বোধহয় ওয়াইল্ডলাইফকে বিরক্ত করে না।' হাত তুলে হরিণের পায়ের ছাপ দেখাল। 'এগুলো বুশবাকের ছাপ। ট্রফি হিসেবে সাংঘাতিক লোভনীয়।'

'আপনি কি সত্যি সত্যি ডোরাকাটা ডিক-ডিক পাবেন বলে আশা করেন?'

'পেলে এমনি পাব, খুঁজতে যাব না।'

উঁচু গাছের ডালে একটা সানবার্ডকে বসে থাকতে দেখল ওরা, পালকগুলো পান্না বসানো টায়রার মত ঝলমল করছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছনটা দেখে নিল রানা, তারপর পড়ে থাকা একটা গাছের গুঁড়িতে বসে নিমাকেও বসতে ইঙ্গিত করল। 'ডিক-ডিক খোঁজার অজুহাতে সবার চোখের আড়ালে এভাবেই পালিয়ে আসতে হবে। এখন বলুন, আসলে ঠিক কি খুঁজব আমরা।'

'একটা সমাধির অবশিষ্ট, কিংবা কোন গোরস্থানের ধ্বংসাবশেষ, যেখানে ফারাও মামোসের সমাধি তৈরি করার সময় শ্রমিকরা বসবাস করত।'

'ইঁট বা পাথরের যে-কোন কাজ,' সায় দিল রানা। 'বিশেষ করে স্তম্ভ বা মনুমেন্ট।'

'টাইটার স্টোন পেস্টামেন্ট।' মাথা ঝাঁকাল নিমা। 'গায়ে হায়ারাগ্লিফিকস খোদাই করা থাকবে। হয়তো রোদ-বৃষ্টিতে ম্লান হয়ে গেছে, খসে পড়েছে, কিংবা ঢাকা পড়েছে ঝোপের ভেতর—আমি জানি না।'

'এখানে আমরা বসে আছি কেন? চলুন মার্চ ধরি।'

বেলা এগারোটার দিকে নদীর তীরে একটা ডিক-ডিকের ছাপ দেখল রানা। বড় একটা গাছের বেরিয়ে থাকা শিকড়ের তলায় লুকাল ওরা, নড়াচড়া না করে চুপচাপ বসে থাকল। কিছুক্ষণ পর খুদে প্রাণীগুলোর একটাকে দু'এক মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল। ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল সেটা, গাছের গুঁড়ির মত শুঁড়টা নাড়ছে, মানবশিশুর টলমল করা পায়ের মত খুর ফেলছে জমিনে, নিচু একটা ডাল থেকে পাতা ছিঁড়ল, ব্যস্তভাবে চিবাল। তবে গায়ের ইউনিফর্মটা ধূসর, কোন রকম দাগ নেই।

ওটা অদৃশ্য হতে উঠে দাঁড়াল রানা। 'কমন ভ্যারাইটি,' বিড়বিড় করল। 'চলুন অন্যদিকে যাই।'

দুপুরের খানিক পর এমন একটা জায়গায় পৌঁছুল ওরা, পাহাড়-প্রাচীরের রঙ

যেখানে গোলাপী-লালচে মাংসের মত। এরকম একজোড়া প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে গহ্বরের ভেতর বেরিয়ে এসেছে নদী। জায়গাটা যতদূর সম্ভব পরীক্ষা করল ওরা, তারপর বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। পাথর এখানে সোজা নেমে এসেছে পানিতে, পানির কিনারায় এমন একটা গর্ত নেই যে পা রাখা যায়।

ভাটির দিকে ফিরে এল ওরা, আদ্যিকালের একটা ঝুলন্ত ব্রিজ ধরে নদী পেরুল। শুকনো লতানো গাছ আর শণ দিয়ে ব্রিজটা সম্ভবত সন্ন্যাসীরাই বানিয়েছেন। এপারে এসেও আরেকবার গহ্বরের ভেতর দিয়ে এগোবার চেষ্টা করল ওরা। লালচে-গোলাপী পাঁচিল পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে, সেটাকে এড়িয়ে এগোতে চেষ্টা করায় দেখা গেল স্রোত এত জোরাল যে রানাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। বাধ্য হয়ে ফিরে আসতে হলো ওকে।

'আমরা যখন এগোতে পারছি না, ধরে নিতে হবে টাইটাও পারেনি।'

ঝুলন্ত ব্রিজের কাছে ফিরে এসে একটা ছায়া খুঁজে নিল ওরা, ওখানে বসে লাঞ্চ খেলো। গরমে সেদ্ধ হবার অবস্থা। নদীর পানিতে রুমাল ভিজিয়ে মুখ মুছল নিমা। চিৎ হয়ে শুয়ে লালচে-গোলাপী প্রাচীর দেখছে রানা, চোখে আঁটা বিনকিউলার। মসৃণ চকচকে সারফেসে কোন ফাটল আছে কিনা খুঁজছে। চোখ থেকে বিনকিউলার না নামিয়েই কথা বলছে ও। 'রিভার গড পড়ে জানা যায়, গ্রেট লায়ন অভ ঈজিপ্ট অর্থাৎ টানুস আর ফারাও-এর লাশ অদলবদল করার জন্যে লোকজনের সাহায্য নিতে হয়েছিল টাইটাকে।' বিনকিউলার সরিয়ে নিমার দিকে তাকাল। 'ব্যাপারটা আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। কারণ ওই যুগে মানুষ এ-ধরনের কাজ করতে ভয় পেত। ভাবছি, ক্রোলের অনুবাদে কোন ভুল হয়নি তো? টাইটা কি সত্যি লাশ বদলাবদলি করেছিল?'

হেসে উঠে রানার দিকে কাত হলো নিমা। 'লেখক উইলবার কিথ এখানে কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। গল্পের এই অংশটুকু তিনি একটা মাত্র বাক্যের ওপর ভিত্তি করে লিখেছেন। বাক্যটি হলো, ''টু মি হি ওয়াজ মোর আ কিং দ্যান এভার ফারাও হ্যাড বীন''।' আবার চিৎ হলো নিমা। 'সেজন্যেই বইটার এত সমালোচনা করি। আমি যতটুকু জানি বা বিশ্বাস করি, টানুস তাঁর নিজের সমাধিতে আছেন, তেমনি ফারাও-ও আছেন নিজের সমাধিতে।'

শেষ বিকেলের দিকে ক্যাম্পে ফিরল ওরা। কিচেন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানাল রুবি। হাঁপাচ্ছে সে। 'কখন ফিরবেন তার অপেক্ষায় ছিলাম। ওলি জারকাস তিমকাতে উৎসবে দাওয়াত দিয়েছেন আমাদের। আল নিমা তাঁর প্রধান অতিথি। গরম পানি রাখা আছে, এখুনি গোসল করে তৈরি হয়ে নিন। তা না হলে মঠে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে।'

ব্যাংকুইট হলে ওদেরকে নিয়ে যাবার জন্যে প্রধান পুরোহিত একদল তরুণ উপাসককে পথ প্রদর্শক হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা এল গোধূলি পার করে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে জ্বলন্ত মশাল। তাদের মধ্যে বাটিও আছে, প্রথমে চিনতে পারল নিমা। তার দিকে তাকিয়ে হাসি দিতে লজ্জায় জড়সড় ভঙ্গিতে এগিয়ে এল সে, নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা বুনো ফুলের একটা গোছা বাড়িয়ে

ধরল নিমার দিকে। প্রস্তুত ছিল না নিমা, কিছু না ভেবেই আরবীতে ধন্যবাদ দিল তাকে।

নিমাকে অবাক করে দিয়ে বাটিও পাল্টা ধন্যবাদ জানাল ওই আরবীতেই। নিমার প্রশ্ন শুনে বাটি বলল, 'আমার মা লোহিত সাগরের ওদিক থেকে এসেছে। আরবী আমার মায়ের ভাষা।'

মঠের উদ্দেশে ওরা যখন রওনা হলো, ভক্ত কুকুরছানার মত নিমার পিছু নিল বাটি।

পাহাড়-প্রাচীরের মাথা থেকে আরেকবার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামল ওরা, বেরিয়ে এল জ্বলন্ত মশাল ঘেরা টেরেসে। গাছপালায় ছাওয়া সরু উদ্যান-পথ লোকজনে ঠাসা, ভিড় সরিয়ে ওদের জন্যে পথ তৈরি করল তরুণ উপাসকরা। তীর্থযাত্রীরা কি ভাবল কে জানে, অ্যামহ্যারিক ভাষায় স্বাগত জানাল ওদেরকে, হাত লম্বা করে ছুঁয়ে দিচ্ছে।

নিচু প্রবেশপথ পেরিয়ে ক্যাথেড্রালের বাইরের অংশে পৌঁছুল ওরা। আজও মনে হলো মশাল আর ল্যাম্পের অনিশ্চিত আলোয় দেয়ালচিত্রের চরিত্রগুলো নাচছে। মেঝেতে নল খাগড়া দিয়ে তৈরি কার্পেট ফেলা হয়েছে, পায়ের ওপর পা তুলে তাতে বসে আছেন সন্ন্যাসীরা, মনে হলো সবাই তাঁরা এখানে উপস্থিত। গলা চড়িয়ে তারাও ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। বসা সন্ন্যাসীদের প্রত্যেকের পাশে একটা করে বোতল, তাতে মধু মিশিয়ে তৈরি করা স্থানীয় মদ তেজ। হাসিখুশি সন্ন্যাসীদের চকচকে চেহারা দেখে বোঝা যায়, এরইমধ্যে ভাল সার্ভিস দিয়েছে বোতলগুলো।

রানার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করল রুবি, 'ইচ্ছে না থাকলেও এই তেজ বা মদ খেতে হবে আপনাকে। না খেলে উৎসব ও পুরোহিতদের অপমান করা হবে। তবে আমি চেখে দেখব, তারপর আপনি খাবেন। রঙ, স্বাদ ও শক্তি বদলে যায়। বড় গামলা বা পিপে থেকে পরিবেশন করা হচ্ছে, একেকটার ধরন একেকরকম।' নিজের বোতল থেকে সরাসরি পান করল সে। 'এটা ভালই। বেশি না খেলে আপনার কোন অসুবিধে হবে না।'

ওদের চারপাশে বসা সন্ন্যাসীরা পান করার জন্যে সাধাসাধি করছে, বাধ্য হয়েই নিজের বোতলটা ধরতে হলো রানাকে। হালকা ও মিষ্টি একটা স্বাদ পেল ও, মধুর পরিমাণ খুব বেশি বলেই হয়তো মদ বলে মনে হলো না। 'ভালই তো!'

'কিন্তু সাবধান,' বলল রুবি। 'তেজের পর নিশ্চয়ই ওরা আপনাকে কাটিকালা সাধবে। কাটিকালা চোলাই করা কড়া মদ, খেলে নিজেকে সামলাতে পারবেন না, ওটা আপনার ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলবে।'

সন্ন্যাসীরা এবার নিমার যত্ন-আত্তির দিকে মন দিয়েছেন। ও যে কপটিক ক্রিশ্চান, এটা তাঁদেরকে প্রভাবিত করেছে। সন্দেহ নেই, ওর রূপ-যৌবনও পবিত্র ও সংযমী চিরকুমারদের চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিয়েছে কিছুটা।

নিমার কানে কানে রানা বলল, 'বোতলটা ঠোঁটে তুলে ভান করুন খাচ্ছেন। তা না হলে ওঁরা আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবেন না।'

নিমা বোতলটা মুখের সামনে তুলতেই উল্লাসে ফেটে পড়লেন সন্ন্যাসীরা।

বোতল নামিয়ে রানাকে নিমা বলল, 'স্বাদটা তো দারুণ। মদ কোথায়, এ তো মধু।'

'মদ না খাবার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললেন?' হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মাত্র এক ফোঁটা,' স্বীকার করল নিমা। 'তাছাড়া, কে বলল আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম খাব না?'

অতিথিদের সামনে গরম পানি ভর্তি একটা করে পাত্র রাখা হলো, হাত ধোয়ার জন্যে। ভোজন পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে। হঠাৎ ড্রামের শব্দ শোনা গেল, তারপর ভেসে এল নানা ধরনের ইন্সট্রুমেন্টের আওয়াজ। মিডল চেম্বারের খোলা দরজা ভরাট করে তুলল মিউজিশিয়ানদের একটা ব্যান্ড। চেম্বারের একদিকের দেয়াল ঘেঁষে আসন গ্রহণ করল তারা।

অবশেষে প্রাচীন প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস ধাপের মাথায় উদয় হলেন। রক্তলাল সাটিনের লম্বা আলখেল্লা পরে আছেন, দুই কাঁধে সোনালি সুতো দিয়ে এমব্রয়ডারির কাজ করা। মাথায় পরেছেন প্রকাণ্ড এক মুকুট। সোনার মত চকচক করলেও রানা জানে ওটা আসলে পালিশ করা পিতল, আর বহুরঙা পাথরগুলো কাঁচ।

হাতের দণ্ড উঁচু করলেন প্রধান যাজক, সেটার মাথায় রুপোর কাজ করা ক্রস। সমস্ত কোলাহল থেমে গিয়ে বিশাল গুহার ভেতর অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল।

দীর্ঘ সময় নিয়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন ওলি জারকাস। প্রার্থনা শেষ হতে দু'জন তরুণ উপাসক ধাপের নিচে নামতে সাহায্য করল তাঁকে। বয়ঃবৃদ্ধ পুরোহিতরা হৃৎপিণ্ড আকৃতির একটা বৃত্ত রচনা করে বসেছেন, সেই বৃত্তের মাথায় তিনি তাঁর প্রাচীন টুলে বসলেন। এরপর টেরেস থেকে মিছিল নিয়ে ভেতরে ঢুকল তরুণ উপাসকরা, প্রত্যেকের মাথায় নল খাগড়ার তৈরি ঝুড়ি, আকারে গরুর গাড়ির চাকার মত। অতিথিদের প্রতিটি বৃত্তের সামনে একটা করে নামিয়ে রাখা হলো।

প্রধান যাজকের সঙ্কেত পেয়ে সব ক'টা ঝুড়ির ঢাকনি একযোগে খোলা হলো। আনন্দে হৈ-চৈ করে উঠলেন সন্ন্যাসীরা। প্রতিটি ঝুড়িতে একটা করে পিতলের গামলা রয়েছে, তাতে হাতে বেলা গোল ময়দার রুটি, গভীর গামলার কিনারা পর্যন্ত ভরাট হয়ে আছে। আরও একদল উপাসক ঢুকল, ভারী পিতলের গামলা বয়ে আনতে বারোটা বাজছে তাদের, টলমল করছে পা। মরিচ আর এলাচের গন্ধে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। এই গামলাগুলো থেকে ধোঁয়া উঠছে, ভেতরে রান্না করা খাসীর মাংস।

পুরোহিত আর সন্ন্যাসীরা রুটি ও মাংসের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, দেখে মনে হলো হিংস্র কোন প্রাণী শত্রু নিধনে মেতে উঠেছে। আহার পর্ব মাত্র শুরু হয়েছে, উপাসকরা পরিবেশন করল ড্রাম ভর্তি তেজ। খাবে কি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে রানা। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীরা মুখ খোলার পর তা আর বন্ধ করছে না, এক হাতে যতটুকু ধরে ভেতরে ভরছে মাংস আর রুটি, না চিবিয়ে ঢক ঢক করে তেজ ঢেলে নামিয়ে দিচ্ছে গলা দিয়ে, এভাবে বিরতিহীন চালিয়ে যাচ্ছে।

মাংসের গামলা খালি হয়ে আসায় রানা ভাবল এবার বোধহয় নোংরা দৃশ্যটা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে। কিন্তু না, তরুণ উপাসকরা এরপর নিয়ে এল আস্ত মুরগীর রোস্ট।

রানার নির্দেশে কিছুই না খেয়ে নিমা ভান করছিল প্রচুর খাচ্ছে, হঠাৎ ম্লান গলায় বলল, 'আমার অসুস্থ লাগছে।'

'চোখ বন্ধ করে ইংল্যান্ডের কথা ভাবুন,' পরামর্শ দিল রানা। 'এই উৎসবের আপনিই স্টার। ওরা আপনাকে পালাতে দেবে না।'

তারপর শুরু হলো চিৎকার, 'কাটিকালা! কাটিকালা!' পুরোহিত বা সন্ন্যাসী, কেউ থামছেন না। উপাসকরা ছুটে বেরিয়ে গেল টেরেসে, খানিক পর ফিরে এল ডজন ডজন বোতল আর চায়ের কাপ নিয়ে। স্থানীয় লোকজনকে কালা কুত্তা বলে গাল দিলেও, খাওয়াদাওয়া শুরু হবার পর দেখা গেল খাদ্যগ্রহণের প্রতিযোগিতায় পুরোহিত আর সন্ন্যাসীদের সঙ্গে জোর পাল্লা দিচ্ছে উস্তাভ। শুধু তাই নয়, প্রতিযোগিতায় সে-ই জিতছে বলে মনে হলো। ওরা দেখল তরুণ উপাসকরা তার পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিচ্ছে। কাটিকালা আসার পর দেখা গেল, চোখের পলক না ফেলে বোতলের পর বোতল খালি করে ফেলছে উস্তাভ।

তারপর এক সময় প্রধান পুরোহিতের চোখে রানা আর নিমার ফাঁকিবাজি ধরা পড়ে গেল। তেজ আর কাটিকালা খেয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন তিনি, দাঁড়াবার পর টলছেন, এলোমেলো পা ফেলে এগিয়ে আসছেন সরাসরি নিমার দিকে, হাতে মাংস ভরা বিশাল এক রুটি, টকটকে লাল ঝোল ঝরছে তা থেকে।

তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ভয়ে কুঁকড়ে গেল নিমা। উপস্থিত সবাই তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রানার বাহু খামচে ধরল নিমা। 'না! প্লীজ, না। বাঁচান আমাকে, রানা। আমি আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব, প্লীজ...'

'প্রধান অতিথি হবার মাসুল দিতে হবে না?' হাসল রানা।

নাটকীয় আবহ তৈরি হলো হঠাৎ করে ব্যান্ড পার্টির সদস্যরা একযোগে বাদ্যযন্ত্র বাজাতে শুরু করায়। পবিত্র উপহার হাতে নিয়ে নিমার সামনে হাজির হলেন মোহন্ত। উপস্থিত পুরোহিত আর সন্ন্যাসীরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন। নিয়তির অমোঘ বিধান কি করে এড়ায় নিমা, অগত্যা চোখ বুজে হাঁ করতে হলো ওকে।

উৎসাহদায়ক গর্জন, করতালি ও বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত ঐকতানের মধ্যে প্রাণপণে চিবিয়ে যাচ্ছে নিমা। ওর মুখ গোলাপি হয়ে উঠল, চোখ বেয়ে দর দর করে পানি ঝরছে। এক পর্যায়ে রানার মনে হলো পরাজয় মেনে নিয়ে সবটুকু উগরে দেবে ও। তবে না, ধীরে ধীরে, সাহসের সঙ্গে, প্রতিবার একটু একটু করে, গিলে ফেলল মুখের খাবার। তারপর নেতিয়ে পড়ল। দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, তাদের উল্লাসধ্বনিতে কান পাতা দায়। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ওর সামনে নিচু হলেন মোহন্ত, হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে ঝুঁকলেন, আলিঙ্গন করলেন ওকে। তারপর আলিঙ্গন ঢিলে না করেই নিমার পাশে নিজের জন্যে জায়গা করে নিলেন তিনি। খেয়াল নেই, মাথার মুকুট পাশে গড়াচ্ছে।

'মনে হচ্ছে আপনি ওঁর হৃদয় জয় করেছেন,' শুকনো গলায় বলল রানা।

'আমার ভয় করছে, দৌড়ে না পালালে যে-কোন মুহূর্তে উনি আপনার কোলে চড়ে বসতে পারেন।'

দ্রুত প্রতিক্রিয়া হলো নিমার। খপ করে কাটিকালার একটা বোতল তুলে নিয়ে মোহন্তের ঠোঁটে ঠেকাল। 'পান করুন!' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন ওলি জারকাস, তবে ওর হাত থেকে পান করার জন্যে ওকে তাঁর ছেড়ে দিতে হলো। বোতল থেকে সরাসরি খানিকটা কাটিকালা পান করে ইঙ্গিত করলেন ওলি জারকাস, অর্থাৎ তিনি নিমার হাত থেকে রুটি মাংস খেতে চাইছেন।

নিমা ইতস্তত করছে দেখে রানা বলল, 'বুড়োকে খুশি রাখতে পারলে ভবিষ্যতে কিছু সুবিধে পাওয়া যেতে পারে।'

রুটি আর মাংস হাতে নিয়ে তাঁকে খাওয়াতে যাবে নিমা, হঠাৎ এমন চমকে উঠল যে হাতের রুটির-মাংস ওলি জারকাসের কোলের ওপর পড়ে গেল। থরথর করে কাঁপছে নিমা, যেন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত, তাকিয়ে আছে পাশে পড়ে থাকা মুকুটটার দিকে।

'কি হলো?' দ্রুত জানতে চাইল রানা, তবে গলাটা চড়তে দেয়নি। হাত বাড়িয়ে নিমার বাহু ধরে ফেলল। উপস্থিত কেউই ওর চমকে ওঠা লক্ষ করেনি। অপর হাতে বোতল ছেড়ে দিয়ে নিমাও রানার বাহু খামচে ধরল, ওর আঙুলের শক্তি অনুভব করে বিস্মিত হলো রানা। শার্ট ভেদ করে ওর নখ চামড়া ছিঁড়ে ফেলছে। 'মুকুটটা দেখুন!' ফিসফিস করল নিমা, হাঁপাতে শুরু করেছে। 'পাথরটা। নীল পাথরটা!'

কাচ ও স্ফটিকের পাথরগুলো সস্তাদরের, তবে ওগুলোর সঙ্গে মুকুটে অল্পদামী কিছু পাথরও আছে। একটা পাথর নীল, আকারে সিলভার ডলারের মত, আসলে নীল সেরামিকের তৈরি সীল, পুরোপুরি গোল, তাপ দিয়ে কঠিন করা হয়েছে। চাকতির মাঝখানে একা মিশরীয় রথ খোদাই করা–ঘোড়া টানা রথ, সামরিক শকট। রথের ওপর খোদাই করা হয়েছে ডানা ভাঙা বাজপাখি। চাকতির বৃত্তাকার কিনারা জুড়ে হায়ারাগ্লিফিক্স-এ লেখা হয়েছে দুটো বাক্য, পড়তে মাত্র কয়েক মুহূর্ত লাগল রানার–

'আমি দশ হাজার রথের নেতৃত্ব দিই।
আমি টাইটা, রাজকীয় আস্তাবলের পরিচালক।'

চোখ ইশারায় বার্তা বিনিময় হলো, কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করা চলবে না। ব্যাপারটা নিয়ে এখুনি আলোচনা করা দরকার, কিন্তু এখান থেকে পালাবে কিভাবে! এই সময় ওদেরকে সাহায্য করল উস্তাভ, হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল মাতালটা, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়ল। টলতে টলতে এগিয়ে এল রুবি, সে-ও মাতাল হতে চলেছে, রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, এখন আমি কি করব?'

কথা না বলে দাঁড়াল রানা, এগিয়ে এসে উস্তাভকে কাঁধে তুলে নিল। পালাবার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যায় না। 'সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ!' বলল ও, যদিও পুরোহিত বা সন্ন্যাসীদের মধ্যে সাড়া দেয়ার মত কাউকে পাওয়া গেল না। টেরেসে বেরিয়ে এল রানা, ওর পিছু নিয়ে মেয়ে দুজনও। কোথাও না থেমে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে ওরা।

'আমার ধারণা ছিল না স্যার রানার শরীরে এত শক্তি!' হাঁপাচ্ছে রুবি, কারণ ধাপগুলো খুব উঁচু আর সিঁড়িটাও খুব লম্বা।

'আমারও তো ধারণা ছিল না,' বলল নিমা, নিজেও বলতে পারবে না কথার সুরে কি কারণে গর্ব প্রকাশ পেল। ছেলেমানুষি কোরো না, নিজেকে চোখ রাঙাল, তোমার কেউ হয় না ও!

কুঁড়েঘরে ঢুকে উস্তাভকে তার বিছানায় ছুঁড়ে দিল রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, ঘামছে দরদর করে। তার কাছে রুবিকে রেখে নিমাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও।

'আপনি দেখেছেন…?' উত্তেজিত গলায় শুরু করল নিমা, তবে ঠোঁটে আঙুল রেখে ওকে চুপ করিয়ে দিল রানা। নিমার ঘরে চলে এল ওরা। 'দেখেছেন আপনি?' আবার জানতে চাইল নিমা। 'পড়তে পেরেছেন?'

'আমি দশ হাজার রথের নেতৃত্ব দিই,' বলল রানা।

'আমি টাইটা, রাজকীয় আস্তাবলের পরিচালক,' বাকিটুকু পূরণ করল নিমা। 'সে এখানে এসেছিল! ওহ্ রানা! টাইটা এখানে এসেছিল! এই প্রমাণটাই খুঁজছিলাম আমরা। এখন আমরা জানি অযথা সময় নষ্ট করছি না!' নিজের বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল। 'আপনার কি ধারণা, প্রধান পুরোহিত সীলটা পরীক্ষা করতে দেবেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না। মুকুটটা মঠের মূল্যবান ধর্মীয় সম্পদ। আপনাকে তাঁর খুব ভাল লাগলেও, দেখতে দেবেন বলে মনে হয় না। তবে, বেশি আগ্রহ দেখানো চলবে না। ওটার তাৎপর্য সম্পর্কে ওলি জারকাসের কোন ধারণা নেই। তাছাড়া, আমরা চাই না উস্তাভ কিছু টের পাক।'

'ঠিক বলছেন।' সরে গিয়ে বিছানায় নিজের পাশে জায়গা করল নিমা। 'বসুন এখানে।'

বসল রানা।

নিমা জানতে চাইল, 'বলুন, সীলটা কোত্থেকে এল? কে পেয়েছিল? কবে, কোথায়?'

'ধীরে, সুন্দরী, ধীরে। একের ভেতর চারটে প্রশ্ন, কোনটারই উত্তর আমার জানা নেই।'

'কল্পনা করুন!' তাগাদা দিল নিমা। 'আঁচ করুন। আইডিয়া দিন।'

'বেশ,' রাজি হলো রানা। 'সীলটা তৈরি করা হয়েছে হংকঙে। ওখানে ছোট্ট একটা কারখানা আছে, হাজারে হাজারে তৈরি করা হয়। মিশরে বেড়াতে গিয়ে ওলি জারকাস একটা কিনে এনেছেন।'

রানার বাহুতে চিমটি কাটল নিমা, জোরে। 'সিরিয়াস হোন!' চোখ রাঙিয়ে নির্দেশ দিল।

'আমার চেয়ে ভাল আইডিয়া থাকলে শোনান,' বাহুটা অপর হাতে ডলছে রানা।

'বেশ, আমিই বলি। ফারাও-এর সমাধি নির্মাণের কাজ চলছে, এ-সময় সীলটা এখানে খাদের ভেতর পড়ে যায় টাইটার হাত থেকে। তিন হাজার বছর

পর বুড়ো এক সন্ন্যাসী, মঠে যারা প্রথম বসবাস করতে আসে তাদের একজন, এটা কুড়িয়ে পান। না, হায়ারাগ্লিফিক্স পড়তে পারেননি। সীলটা তিনি তখনকার প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যান, প্রধান পুরোহিত ওটাকে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস-এর একটা অলঙ্কার বলে ঘোষণা করেন, এবং সেট করেন মুকুটে।'

'আইডিয়াটা মন্দ নয়,' বলল রানা।

'আপনি কোন ফুটো দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল নিমা, উত্তরে মাথা নাড়ল রানা। 'তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে টাইটা সত্যিসত্যি এখানে ছিল, এবং তাতে প্রমাণ হয় আমাদের থিওরি মিথ্যে নয়?'

'প্রমাণ খুব কঠিন শব্দ। আসুন বলি, সব মিলিয়ে ওদিকটাই নির্দেশ করছে।'

বিছানার ওপর শরীরটা মুচড়ে পুরোপুরি রানার দিকে ফিরল নিমা। 'ওহ্, রানা, উত্তেজনায় কাঁপছি আমি! যীশুর কিরে, আজ রাতে আমি এক মিনিটও ঘুমাতে পারব না। এই, আমরা আবার সার্চ শুরু করব কখন?'

নিমার চোখ জোড়া উত্তেজনায় চকচক করছে, রক্তিম মুখে গোলাপী আভা। ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো, ভেতরে লালচে জিভের ডগা দেখতে পাচ্ছে রানা। এবার নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না ও। ধীরে ধীরে নিমার দিকে ঝুঁকল, ইচ্ছে করেই, এড়িয়ে যেতে চাইলে যাতে সুযোগ পায় নিমা।

'না,' বলার এক সেকেন্ড পর নিজেকে সরিয়ে দিল নিমা, যেন ইচ্ছের বিরুদ্ধে। 'প্লীজ, না। আমি…আমি এ-সব পছন্দ করি না।'

সিধে হয়ে বসল রানা, নিমার একটা হাত তুলে নিয়ে নিজের তালুর ওপর রাখল। তারপর ওর হাতে ঠোঁট ছোঁয়াল, মাত্র একবার। 'কাল সকালে দেখা হবে,' বলে হাতটা ছেড়ে দিল ও, দাঁড়িয়ে পড়ল। 'খুব ভোরে, কেমন? তৈরি থাকবেন।' মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ও।

সাত

পরদিন ভোরে কাপড় পরার সময় পাশের ঘরে নিমার নড়াচড়ার আওয়াজ পেল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু শিস দিতে বেরিয়ে এল নিমা, তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিল, রওনা হবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে আছে।

'মির এখনও জাগেনি,' ওদেরকে নাস্তা পরিবেশনের সময় জানাল রুবি।

'অবাক কাণ্ডই বলব আমি।' নিজের প্লেটে তাকিয়ে আছে রানা। কাল রাতের ঘটনা মনে থাকায় ওর মত নিমাও আড়ষ্ট হয়ে আছে। তবে রাইফেল আর প্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে উপত্যকা ধরে রওনা হতে স্বাভাবিক হয়ে উঠল ওরা, চোখে-মুখে উত্তেজনা ও প্রত্যাশা ফুটে উঠল।

ঘণ্টাখানেক হলো হাঁটছে, এই সময় ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, তারপর নিমার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে সাবধান করে দিল, 'পিছনে কেউ

লেগেছে।'

কব্জি চেপে ধরে স্যান্ডস্টোনের বড় একটা বোল্ডারের আড়ালে নিমাকে টেনে নিয়ে এল রানা। আড়ালে পৌঁছে শুয়ে পড়ল ওরা। লাফ দেয়ার ভঙ্গি নিল রানা, ডাইভ দিয়ে পড়ল নোংরা জোব্বা পরা রোগা-পাতলা একটা মূর্তির ওপর। উপত্যকা ধরে ওদের পিছু পিছু উঠে এসেছে সে। চিৎকার দিয়ে জমিনে হাঁটু গাড়ল মূর্তিটা, ভয়ে ফোঁপাতে শুরু করল।

রানা তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দাঁড় করাল। 'বাটি! পিছু নিয়েছ কেন? কে পাঠিয়েছে তোমাকে?' আরবীতে জানতে চাইল ও।

চোখ ঘুরিয়ে নিমার দিকে তাকাল বাটি। 'না, মাফ চাই! দয়া করুন, মারবেন না! আমি কোন ক্ষতি করতে চাইনি।'

'ছেড়ে দিন ওকে, রানা। তা না হলে আবার খিঁচুনি শুরু হবে।'

রানা ছেড়ে দিতেই ছুটে এসে নিমার পিছনে লুকাল বাটি, ভয়ে ওর একটা হাত আঁকড়ে ধরল, উঁকি দিয়ে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'মারব না, সত্যি কথা বললে মারব না,' তাকে অভয় দিল রানা। 'কিন্তু সত্যি কথা না বললে গায়ের চামড়া তুলে নিয়ে গাছে ঝোলাব। কে তোমাকে পাঠিয়েছে?'

'আমি নিজে থেকে এসেছি। কেউ আমাকে পাঠায়নি,' কাঁপতে কাঁপতে বলল বাটি। 'ওই জায়গাটা দেখাব আপনাদের, যেখানে পবিত্র ডিক-ডিক আমাকে দেখা দিয়েছিল। ওটার চামড়ায় ব্যাপ্টিস্টের আঙুলের ছাপ ছিল।'

হেসে ফেলল রানাও। 'ও সত্যি কথা বলছে কিনা সন্দেহ আছে আমার। আমি যতটুকু বুঝি, ডোরাকাটা ডিক-ডিকের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই।' বাটির দিকে তাকাল ও। 'যদি বুঝি যে মিথ্যে বলছ, সত্যি সত্যি তোমাকে গাছে ঝোলানো হবে, মনে থাকে যেন।'

'আমি মিথ্যে কথা বলছি না,' বলে ফোঁপাতে শুরু করল কিশোর ছেলেটা।

নাক গলাল নিমা। 'কেন শুধু শুধু ভয় দেখাচ্ছেন ওকে! ও আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।' বাটির মাথায় আদর করে হাত বুলাল।

'ঠিক আছে, তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া হলো,' বলল রানা। 'নিয়ে চলো আমাদের, দেখি কোথায় দেখেছিলে পবিত্র ডিক-ডিক।'

আবার রওনা হলো ওরা। বাটি হাঁটছে না, বলা চলে নিমার পাশে নাচছে, হাতটাও সে ছাড়তে রাজি নয়। একশো গজও পেরোয়নি, চেহারা থেকে ভয়-ডর সব উধাও হয়ে গেল, আহ্লাদে আটখানা অবস্থা। চোখে-মুখে লাজুক ভাব নিয়ে খিকখিক করে হাসছে।

এক ঘণ্টা ওদেরকে পথ দেখাল বাটি, ডানডেরা নদী থেকে দূরে সরিয়ে আনল। উপত্যকার অনেক ওপর, উঁচু জমিনে উঠে আসার পর লাইমস্টোনের রিজ দেখতে পেল ওরা, হুকের মত কাঁটা নিয়ে ঘন ঝোপগুলো গোটা এলাকাটাকে দুর্গম করে রেখেছে। ঝোপগুলো পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগানো, দেখে মনে হচ্ছে এগোবার কোন পথ নেই। তবে আঁকাবাঁকা একটা সরু পথ ঠিকই খুঁজে বের করল বাটি, এত কম চওড়া যে দু'পাশের কাঁটাঝোপ এড়াতে ধীর পায়ে সাবধানে

হাঁটতে হচ্ছে। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল বাটি, নিমার কব্জিতে টান দিয়ে ওকেও নিজের পাশে দাঁড় করাল। হাত দিয়ে নিচের দিকটা দেখাল সে, প্রায় নিজের পায়ের আঙুলগুলো।

'নদী!' বলল বাটি, গলায় উল্লাস। তার পাশে এসে দাঁড়াল রানা, অবাক হয়ে শিস দিল মৃদু। বিশাল এক বৃত্ত তৈরি করে বাটি ওদেরকে পশ্চিমে নিয়ে এসেছে, তারপর ফিরিয়ে এনেছে ডানডেরা নদীর এমন একটা পয়েন্টে যেখানে প্রবাহটা এখনও বয়ে চলেছে গভীর নালার তলায়।

এই মুহূর্তে সেই গহ্বরের একেবারে কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। একবার তাকিয়েই রানা লক্ষ করল, পাথুরে নালার মাথার দিকটা একশো ফুটের কম চওড়া হলেও, রিম-এর নিচে গহ্বরটা প্রসারিত হয়েছে। বহু নিচের পানির সারফেস থেকে উঠে আসা পাথরের পাঁচিল মাটির তৈরি তেজ বোতলের মত ক্রমশ ফুলে উঠেছে। আবার ওটা সরু হয়েছে মাথার কাছাকাছি যেখানে ওরা দাঁড়িয়ে। 'ওখানে দেখেছি,' গহ্বরের অপরদিকটা দেখাল বাটি। ওখানে কাঁটাঝোপের ভেতর থেকে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে এসেছে। ধনুকের মত বাঁকা পাথুরে পাঁচিলে ঝুলে আছে সবুজ শ্যাওলার জাল, তা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে পড়ছে দুশো ফুট নিচের নদীতে।

'ওপারে যদি দেখে থাকো, আমাদেরকে এপারে আনলে কেন?'

চেহারা দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে বাটি। 'এদিকে আসাটা সহজ। ওপারের জঙ্গলে কোন পথ নেই। ঝোপের কাঁটা লাগবে মেমসাহেবকে।'

বাটির কাঁধে হাত রেখে চাপ দিল নিমা। গহ্বরের ঠোঁটে ঝুলে থাকা একটা গাছের ছায়ায় বসে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত হলো। ইতিমধ্যে দুপুর পেরিয়ে গেছে, গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যাচ্ছে শরীর। নিমাকে রানা ইংরেজিতে বলল, 'মুকুটে টাইটার সেরামিক সম্পর্কে বাটি কিছু জানলেও জানতে পারে, আপনি ওকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

প্রথমে অন্য প্রসঙ্গে আলাপ জুড়ল নিমা, মাঝে মধ্যে বাটির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কি, প্রধান পুরোহিতের মুকুটে নীল পাথরটা?'

'সেইন্টের পাথর ওটা, সেন্টফ্রুমেনটিয়াসের প্রধান প্রিস্ট বলেন, যীশুর মতই পুরানো ওটা।'

'কোত্থেকে এল ওটা, জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল বাটি। 'বোধহয় আকাশ থেকে পড়েছে। তারপর হয়তো সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মারা যাবার সময় প্রধান প্রিস্টকে দিয়ে যান। কিংবা তাঁর কফিনে ছিল, কবরে ঢোকানোর আগে বের করে নেয়া হয়।'

'হ্যাঁ, হয়তো। বাটি, তুমি সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের কবর দেখেছ?'

ভয়ে ভয়ে চারদিকে চোখ বুলাল বাটি, যেন কোন অপরাধ করে ফেলেছে। 'শুধু অধিকারী প্রিস্টদের মাকডাসে ঢোকার অনুমতি আছে,' মাথা নিচু করে বিড়বিড় করল সে।

'তুমি দেখেছ,' নরম সুরে অভিযোগ করল নিমা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়।

বাটির সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করে উৎসাহ বোধ করছে ও। 'আমাকে বলতে পারো, আমি কাউকে বলব না।'

'মাত্র একবার,' স্বীকার করল বাটি। 'আমার বয়সী কয়েকটা ছেলে টাবট পাথরটা ছোঁয়ার জন্যে জোর করে পাঠায় আমাকে। না গেলে ওরা আমাকে মারধর করত। প্রিস্টের সহকারী সব ছেলেকেই পাঠায় ওরা।' ঘটনাটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তার চেহারা শুকিয়ে গেল। 'সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম। কেউ ছিল না, আমি একা। তখন মাঝরাত, প্রিস্টরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চারদিক অন্ধকার। মাকডাসে তো সেইন্টের আত্মা ঘুরে বেড়ায়, তাই না? ওরা আমাকে বলে দিয়েছিল, আমি যদি অযোগ্য বা অপবিত্র হই তাহলে সেইন্ট আমার মাথায় বাজ ফেলবেন।'

'সেইন্টের কবর পর্যন্ত গেলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল নিমা। 'সমাধির ভেতরে ঢুকলে?'

মাথা নাড়ল বাটি। 'ঢোকার মুখে বার আছে। সেইন্টের জন্মদিনে শুধু প্রধান প্রিস্ট ওখানে ঢুকতে পারেন।'

'তুমি তাহলে বারের ভেতর দিয়ে তাকালে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার। সেইন্টের কফিন অবশ্য দেখা যাচ্ছিল। কাঠের কফিন, গায়ে পেইন্টিং আছে–সেইন্টের মুখ।'

'তিনি কি কালো?'

'না, ফর্সা। লাল দাড়ি আছে। পেইন্টিংটা খুব পুরানো। ঝাপসা হয়ে গেছে। কফিনের কাঠ পচে গেছে, গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ছে।'

'সমাধির মেঝেতে শোয়ানো কফিনটা?'

'না। পাথরের একটা শেলফে খাড়া করা।'

'আর কিছু মনে করতে পারো তুমি?' বাটি মাথা নাড়তে নিমা অন্য প্রশ্ন করল তাকে, 'কফিনটা কি মাকডাসের পিছনের দেয়ালে?'

'হ্যাঁ। বেদি আর টাবট পাথরের পিছনে।'

'বেদিটা কি দিয়ে তৈরি? পাথর দিয়ে?'

'কাঠের বেদি। মোমবাতি আছে, বড় একটা ক্রস আছে, কয়েকটা মুকুটও আছে। আর আছে পানপাত্র।'

'বেদির গায়ে কি ছবি আঁকা আছে?'

'না, খোদাই করা ছবি আছে। মুখগুলো কেমন যেন, কাপড়চোপড়ও অন্য রকম। ঘোড়া আছে।'

'টাবট সম্পর্কে বলুন,' রানাকে জিজ্ঞেস করল নিমা। 'আমাদের চার্চে টাবট স্টোন বলে কিছু নেই।'

'আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ কি। বাটি কিছু বলতে পারে কিনা দেখুন।'

নিমার প্রশ্ন শুনে টাবট সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারল না বাটি, শুধু জানাল, 'ওটা কাপড়ে মোড়া। সবাই বলে, শুধু সেইন্টের জন্মদিনে প্রধান প্রিস্ট ওটা খোলেন।'

রানা ও নিমা দৃষ্টি বিনিময় করল, তারপর রানা বলল, 'চিন্তা করে বের করুন

আমরা কিভাবে দেখতে পারি।'

'সেইন্টের জন্মদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে, আপনাকে হতে হবে ভারপ্রাপ্ত প্রিস্ট...' হঠাৎ সচকিত দেখাল নিমাকে, ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আপনি কি...না, তা আপনি ভাবতে পারেন না।'

'আরে না, তা কি আমি ভাবতে পারি!'

'মাকডাসে আপনি ধরা পড়লে ওরা আপনাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে।'

'উত্তরটা হলো, ধরা না পড়া।'

'আপনি গেলে আমিও যাব। কিভাবে ম্যানেজ করবেন?'

'ধীরে।' রানার ঠোঁটে অলস হাসি। 'মাত্র দশ সেকেন্ড হলো আইডিয়াটা মাথায় এসেছে। প্ল্যান করার জন্যে অন্তত দশটা মিনিট সময় দিন।'

দু'জনেই ওরা গহ্বরের ওপারে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল। নিস্তব্ধতা ভাঙল নিমা, 'কাপড়ে মোড়া একটা পাথর। টাইটার স্টোন টেস্টামেন্ট?'

'জোরে বলবেন না, শয়তান শুনছে।'

হঠাৎ চিৎকার দিল বাটি। 'ওই দেখুন! ওদিকে তাকান!' নিমার হাত ধরে ঝাঁকাল সে। 'বলেছি না!' অপর হাতে নদীর ওপারটা দেখাচ্ছে। 'কাঁটাঝোপের কিনারায়! দেখতে পাচ্ছেন না?'

'কি? কি দেখব?'

'ডোরাকাটা ডিক-ডিক। জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের ডিক-ডিক। গায়ে পবিত্র ছাপ...'

ওপারের ঝোপের গায়ে নরম, খয়েরি একটা অস্পষ্ট প্রলেপ দেখতে পেল নিমা। 'কি জানি। এত দূর থেকে...'

প্যাক হাতড়ে বিনকিউলার বের করল রানা। কিছুক্ষণ দেখার পর হেসে উঠল। 'মাই গড! দেখিয়াও না হয় প্রত্যয়! এ তো সত্যি সত্যি ডোরাকাটা ডিক-ডিক!' বিনকিউলারটা নিমার হাতে ধরিয়ে দিল।

আগের দিন সাধারণ যে ডিক-ডিকটা ওরা দেখেছিল, আকারে এটা তার অর্ধেক হবে। গায়ের রঙও ধূসর নয়, উজ্জ্বল লালচে খয়েরি। তবে প্রথমেই চোখে লাগে কাঁধে ও পিছনদিকের গাঢ় চকলেট রঙের ডোরাগুলো–পাঁচটা দাগ, পরস্পরের সঙ্গে সমান দূরত্বে, দেখে সত্যিসত্যি মনে হবে পাঁচ আঙুলের ছাপ।

ডিক-ডিকের অর্ধেক গায়ে ছায়া পড়েছে, বাতাস শোঁকার সময় নাক কোঁচকাচ্ছে। মাথা উঁচু করে আছে, সন্দিহান ও সতর্ক।

রাইফেলটা হাতে নিল রানা, বোল্ট টেনে চেম্বারে একটা রাউন্ড ঢোকাল। নিমা জানতে চাইল, 'গুলি করবেন নাকি?'

'এখুনি না। ছোট টার্গেট, তিনশো গজ দূরে। মাথা নাড়ল রানা। 'আরও কাছে আসার অপেক্ষায় থাকব।'

কথা না বলে চোখে আবার বিনকিউলার তুলল নিমা। পালিয়ে যা, পালিয়ে যা, মনে মনে বলছে। কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে গহ্বরের দিকে এগিয়ে আসছে ডিক-ডিক।

'দুশো গজ,' বিড়বিড় করল রানা, শুয়ে পড়েছে ও, টেলিস্কোপ সাইটে চোখ। এই সময় হঠাৎ উত্তেজনায় টান টান হলো খুদে হরিণ, ফেলে আসা পথ ধরে

ছুটল, অদৃশ্য হয়ে গেল কাঁটাঝোপের ভেতর।

'ভয় পেল কেন?' বলার পর মুখের ভাব বদলে গেল রানার। বাতাসে কিসের যেন একটা গুঞ্জন, প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। 'হেলিকপ্টার!' নিমার হাত থেকে বিনকিউলার নিয়ে আকাশের দিকে তাক করল। আকাশে মেঘ নেই, একটু পরই যান্ত্রিক ফড়িংটাকে দেখা গেল। কাঠামোটা চিনতে পারল রানা। 'বেল জেট রেঞ্জার। এদিকেই আসছে। আসুন, লুকিয়ে পড়ি।'

কাঁটাঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল ওরা। হেলিকপ্টারটাকে এখনও বিনকিউলারে ধরে রেখেছে রানা। 'সম্ভবত ইথিওপিয়ান এয়ার ফোর্স, অ্যান্টি গুফতা টহলে বেরিয়েছে। না, দেখে তো সামরিক বলে মনে হচ্ছে না। সবুজ আর লাল ফিউজিলাজ, লাল ঘোড়া। লাল ঘোড়া তো প্রক্সি এক্সপ্লোরেশনের লোগো।'

কাছাকাছি চলে আসায় নিমা এখন খালি চোখেই লোগোটা দেখতে পাচ্ছে। ওদের সামনে আধ মাইল দূরে রয়েছে 'কপ্টার, উড়ে যাচ্ছে নীল নদের দিকে।

'জ্যাক রাফেল ভাল একটা বাহন পেয়েছে,' বলল রানা। 'যখন খুশি আমাদের ওপর নজর রাখতে পারবে।'

'কপ্টারটা উপ-খাদের কুঁজ পেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সম্ভবত মঠের দিকে যাচ্ছে।

'বসের নির্দেশে ওরা সম্ভবত আমাদের ক্যাম্প খুঁজছে,' আন্দাজ করল রানা। 'চলুন, ফিরি। না, সবুর!' এঞ্জিনের আওয়াজ আবার বাড়তে শুরু করেছে। ঝোপ-ঝাড়ের ফাঁকে আবার 'কপ্টারটাকে দেখা গেল, ওদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। 'নদীটাকে অনুসরণ করছে ওরা,' বলল রানা। 'কিছু খুঁজছে বলে মনে হয়।'

'আমাদের?'

এই সময় ওদেরকে চমকে দিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটল বাটি। 'বাঁচাও!' তারস্বরে চিৎকার করছে। 'কে কোথায় আছ বাঁচাও আমাকে! শয়তান তাড়া করেছে! যীশু তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বাঁচাও!' ফাঁকা জায়গায় বেরিয়েও থামছে না, ছুটছে এখনও।

পাইলট তাকে দেখে ফেলেছে, 'কপ্টার ঘুরে গেছে ওদের দিকে। খুব নিচু দিয়ে এল ওটা, গহ্বরের ঠোঁটের কাছে স্থির হলো শূন্যে। ফরওয়ার্ড কেবিনের উইন্ডস্ক্রীনের ভেতর দুটো মাথা দেখতে পাচ্ছে ওরা। আরও নিচে নামছে পাইলট। নদীর ওপর ঝুলে থাকল। ঝোপের ভেতর কুঁকড়ে আছে ওরা, রানাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে নিমা। কানে ভারী রেডিও এয়ারফোন আর গাঢ় চশমা থাকলেও জ্যাক রাফেলকে চিনতে পারল ওরা। পাইলট কালো। দু'জনেই গলা লম্বা করে নিচে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। ধরা পড়ে যাওয়ায় এখন আর লুকিয়ে থাকার কোন মানে হয় না। হাত-পা ছড়িয়ে পিছনের গাছে হেলান দিল রানা, হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিয়ে হাত নাড়ল রাফেলের উদ্দেশে।

ফোরম্যান সাড়া দিল না। রানার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে দেশলাই জ্বালল, ঠোঁটে ঝোলা আধ পোড়া চুরুটে ধরাল আগুনটা। কাঠিটা ফেলে দিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল রানার দিকে, তারপর কি যেন বলল পাইলটকে। ওপরে উঠল

'কপ্টার, বাঁক ঘুরে উত্তর দিকে চলে গেল।

'শুধু আমাদেরকে নয়, আমাদের ক্যাম্পটাও দেখে গেল ওরা,' বলল নিমা।

'চলুন, ফিরি,' বলল রানা। 'কাল আবার আসা যাবে।'

'ওদেরকে আমার ভয়ই লাগছে,' বলল নিমা, তবে রানা চুপ করে আছে দেখে প্রসঙ্গ বদলে জানতে চাইল, 'বাটির আবার খিঁচুনি শুরু হয়নি তো?'

পথের ধারেই পাওয়া গেল তাকে। কাঁপছে সে এখনও, কাঁদছে, তবে খিঁচুনি ওঠেনি। নিমা গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে শান্ত হলো সে। ওদের পিছন পিছন অনেক দূর এল, তারপর কখন এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল মঠের দিকে।

সন্ধের আগে আরেকবার মঠ দেখতে এল ওরা। পাথুরে ক্যাথেড্রালের প্রবেশমুখে থামল, তারপর আউটার চেম্বারে ঢুকে তরুণ উপাসকদের ভিড়ে মিশে গেল। খোলা দরজা দিয়ে মিড্ল্ চেম্বারের ভেতর তাকিয়ে ফিসফিস করল নিমা, 'বাটির কথা থেকে বোঝা যায়, ডিউটিতে থাকা প্রিস্ট কখন ঘুমিয়ে পড়বে তার অপেক্ষায় থাকে শিক্ষানবিস তরুণরা।'

দেখা গেল পুরোহিতরা বিনা বাধায় ভেতরে আসা-যাওয়া করছেন, কারও অনুমতির জন্যে কোথাও থামছেন না। তবে দরজায় পাহারায় দাঁড়ানো পুরোহিতদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের সময় নাম ধরে সম্বোধন করছেন সবাই। পরস্পরকে সবাই তাঁরা চেনেন। রানা বলল, 'সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ নিয়ে ভেতরে ঢুকলাম, তারপর ধরা পড়ে গেলাম। পবিত্র এলাকায় অনুপ্রবেশের সাজাটা যেন কি?'

'নীলনদের বুভুক্ষু কুমীরের খোরাক বানানো হয় না তো?' হেসে উঠল নিমা। 'তবে আমাকে না নিয়ে ওখানে আপনি ঢুকছেন না।'

এ নিয়ে এখুনি তর্ক করতে রাজি নয় রানা। খোলা দরজা দিয়ে যতটুকু পারা যায় দেখে নিতে চাইছে ও। আউটার চেম্বারের চেয়ে মিড্ল্ চেম্বারটা আকারে ছোট বলে মনে হলো। ভেতরে ছায়ার ভেতর দেয়ালচিত্র দেখা যাচ্ছে। মুখোমুখি দেয়ালে আরেকটা দরজা। বাটির বর্ণনা অনুসারে ওটা মাকডাসে ঢোকার পথ। ফাঁকটা বন্ধ করা হয়েছে গ্রিলের গেট বসিয়ে। গেটের ফ্রেমটা গাঢ় রঙের কাঠ দিয়ে তৈরি, তবে বারগুলো লোহার।

দরজার দু'পাশে পাথুরে সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত এমব্রয়ডারি করা পর্দা ঝুলছে, তাতে সেইন্ট ফ্রুমেনটিয়াসের জীবন কাহিনী থেকে নেয়া দৃশ্য ফুটে উঠেছে। একটা দৃশ্যে নতমস্তকে সমবেত শিষ্যদের ধর্মীয় বাণী শোনাচ্ছেন তিনি, এক হাতে বাইবেল, অপর হাতটা আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে ওপরে তোলা। আরেকটা পর্দায় ফুটে উঠেছে একজন সম্রাটকে ব্যাপ্টিজমে দীক্ষিত করার দৃশ্য। ওলি জারকাসের মতই মাথায় উঁচু আর সোনালি মুকুট পরে আছেন সম্রাট, সেন্টের মাথার চারপাশে একটা বলয়। সম্রাটের মুখ কালো, তবে সেইন্টের মুখ সাদা।

'ইতিহাস কি এখানে বিশুদ্ধ?' বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্নটা করল রানা।

'কি ভেবে হাসছেন আপনি?' জানতে চাইল নিমা। 'ভেতরে ঢোকার কোন উপায় পেয়ে গেছেন?'

'না, ভাবছি ডিনারের কথা। চলুন, ফিরি।'

ডিনারে বসে দেখা গেল উস্তাভ ঢক ঢক করে শুধু মদই খাচ্ছে। সারাদিন কে কি করল বা দেখল আলোচনা হচ্ছে। ডোরাকাটা ডিক-ডিক প্রসঙ্গটা তুলতে যাচ্ছিল নিমা; চোখ ইশারায় নিষেধ করল রানা, নিচু গলায় বলল, 'জানলে কাল ওরা আমাদের সঙ্গে যেতে চাইবে।'

'মিস্টার রানা, স্যার, মা জননী কি আপনাকে ভদ্রতা বলে কিছু শেখাননি? সবাই না বুঝলে, সে ভাষায় কথা বলতে নেই। নিন, খানিকটা ভদকা খান।'

'আমার ভাগটুকুও আপনি খেয়ে ফেলুন,' বলল রানা।

ডিনারের সময় প্রায় কোন কথাই বলছে না রুবি। করুণ আর বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। নিমা লক্ষ করল, স্বামীর দিকে ভুলেও সে তাকাচ্ছে না। ডিনার শেষ হতে রানা আর নিমা উঠে পড়ল, আগুনের ধারে স্ত্রীকে বসিয়ে রাখল উস্তাভ।

নিজেদের কুঁড়ের দিকে যাবার সময় রানা বলল, 'যেভাবে গিলছে উস্তাভ, আজ রাতেও না বউকে ধরে পেটায়।'

'আজ সারাদিন রুবির ওপর অত্যাচার করেছে লোকটা,' বলল নিমা। 'আমাকে রুবি বললেন, আদ্দিস আবাবায় ফিরেই স্বামীকে ছেড়ে দেবেন।'

'এরকম একটা জানোয়ারের সঙ্গে বিয়ে হলো কি করে? দেখতে তো খুবই সুন্দর, ভাল একজনকে বেছে নিতে পারলেন না?'

'সব মেয়ে সমান নয়,' জবাব দিল নিমা। 'কিছু মেয়ে জানোয়ার দেখলে আকৃষ্ট হয়। বিপদের মধ্যে রোমাঞ্চ থাকে, সেটাই বোধহয় কারণ। সে যাই হোক, রুবি জানতে চাইছেন কাল আমাদের সঙ্গে বেরুতে পারবেন কিনা। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন বেচারি।'

'অন্তত ওঁকে রেহাই দেয়ার জন্যে সঙ্গে নেয়া দরকার,' রাজি হলো রানা।

পরদিন ভোর হবার আগেই রওনা হলো ওরা। রিগবি হাতে রানা সামনে থাকল, পিছনে মেয়ে দুজন কথা বলতে বলতে আসছে। ডোরা-কাটা ডিক-ডিক সম্পর্কে জানানো হলো রুবিকে, ওদের প্ল্যানটাও ব্যাখ্যা করা হলো। আগের দিন বাটি যে পথ ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পথটাই অনুসরণ করছে ওরা।

সূর্য বেশ অনেকটা ওপরে উঠে আসার পর ফাটলটার ঠোঁটে, কাঁটা-ঝোপের নিচে পৌঁছুল ওরা। ওত পেতে বসে থাকা ছাড়া আজ কোন কাজ নেই ওদের। খানিক পর নিমা জিজ্ঞেস করল, 'বেচারি ডিক-ডিককে যদি গুলি করতে পারেন, ওপার থেকে সেটাকে আনবেন কিভাবে?'

'ক্যাম্প ছাড়ার আগেই ব্যবস্থা করেছি,' বলল রানা। 'হেড ট্র্যাকারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। গুলির শব্দ হলে রশি নিয়ে হাজির হবে সে, ওপারে পৌঁছুতে সাহায্য করবে আমাকে।'

ওদের নিচে ফাটলটার দিকে তাকাল রুবি। 'এর ওপর দিয়ে ওপারে যেতে কোনদিনই রাজি হব না আমি।'

রুবি আর নিমা রানার কাছাকাছি শুয়ে পড়ল, নিচু গলায় গল্প করছে। হাতে রিগবি নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা, কাঁটা গাছে হেলান দিয়ে। দুপুর পেরিয়ে গেল, ডিক-ডিকের দেখা নেই।

গরমে সেদ্ধ হচ্ছে মেয়েরা। অনেক আগেই মুখ বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। ঝিমুনি এসে যাচ্ছে।

আরও প্রায় আধঘণ্টা পর কি একটা শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল রানার। ওর পিছনের কাঁটাঝোপ থেকে আওয়াজটা এসেছে বলে মনে হলো। খুবই অস্পষ্ট, তবে পরিচিত। এমন একটা শব্দ, এক নিমেষে পুরোপুরি সজাগ করে তুলেছে ওকে, পালস রেট বাড়িয়ে দিয়েছে, ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত নেমে এল শিরদাঁড়া বেয়ে। একে-ফরটিসেভেনের সেফটি ক্যাচ সামনে ঠেলে 'ফায়ার'পজিশনে আনা হয়েছে।

এক ঝটকায় কোল থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে দু'বার গড়ান দিল রানা, শরীর মুচড়ে পাশে শুয়ে থাকা মেয়ে দুটোকে আড়াল দেয়ার চেষ্টা। একই সঙ্গে রিগবিটা কাঁধে তুলে ফেলেছে, তাক করেছে পিছনের ঝোপ।

'মাথা তুলবেন না,' হিসহিস করল রানা। 'নিচে রাখুন মাথা!' ট্রিগারে আঙুল, পাল্টা গুলি করার জন্যে প্রস্তুত। টার্গেট দেখতে পেয়েই ব্যারেল ঘোরাল সেদিকে।

বিশ কদম দূরে এক লোক গুঁড়ি মেরে বসে আছে, হাতের অ্যাসল্ট রাইফেল সরাসরি রানার মুখে তাক করা। চকচকে কালো লোকটা, ছেঁড়া-ফাড়া ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ-পরে আছে, মাথার নরম ক্যাপটাও তাই। ওয়েবিং বেল্টে একটা বুশনাইফ, গ্রেনেড, পানির বোতল ও গেরিলাযোদ্ধার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে। প্রফেশনাল গুণ্ডা, চিন্তা করছে রানা, ঝুঁকি নেয়া যায় না। একই সঙ্গে উপলব্ধি করল, ইচ্ছে থাকলে এতক্ষণে মেরে ফেলতে পারত ওকে।

রিগবি তাক করল রানা অ্যাসল্ট রাইফেল মাজলের এক ইঞ্চি ওপরে, ওটার পিছনে গেরিলার রক্তলাল ডান চোখে।

অচল বা চালমাত অবস্থা; চোখ সরু করে জানান দিল লোকটা। তারপর আরবীতে নির্দেশ দিল, 'জাওয়াদ, মেয়ে দুটোকে কাভার দাও। লোকটা নড়লে গুলি করবে ওদের।'

খসখস আওয়াজ শুনে একপাশে তাকাল রানা। ঝোপের আড়াল থেকে আরেকজন গেরিলা বেরিয়ে এল। একই ড্রেস, তবে কোমরের কাছে ধরে আছে রাশিয়ান আরপিডি লাইট মেশিন গান। সাবধানে এগিয়ে এসে পয়েন্ট-ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে মেয়েদের ওপর মেশিন গান তাক করল সে।

ওদের চারপাশের ঝোপ থেকে আরও আওয়াজ আসছে। দু'জন নয়, গেরিলাদের গোটা একটা গ্রুপ, বুঝতে পারল রানা। জানে, মাত্র একটা গুলি করার সুযোগ পাবে ও। ফলাফল যা-ই হোক, নিমা আর রুবি ততক্ষণে লাশে পরিণত হবে।

মাজলটা ধীরে ধীরে নিচু করল রানা। তারপর মাটিতে রাইফেল নামিয়ে মাথার ওপর হাত তুলল। 'ওরা যা বলে শুনুন।'

সিধে হলো গেরিলা লীডার, নিজের লোকদের সঙ্গে দ্রুত কথা বলছে। 'ওর রাইফেল আর প্যাক নিয়ে নাও।'

'আমরা বিদেশী নাগরিক,' বলল রানা। 'সাধারণ ট্যুরিস্ট। যোদ্ধা বা সরকারী লোক নই।'

'কথা নয়, একদম চুপ!' কঠিন সুরে খেঁকিয়ে উঠল লীডার। আড়াল থেকে

গেরিলারা বেরিয়ে আসছে। সব মিলিয়ে পাঁচজনকে দেখতে পাচ্ছে রানা, তবে অনেকেই হয়তো সামনে বেরোয়নি। নড়াচড়ার ধরনই বলে দেয় প্রফেশনাল, গুলির পথে বাধা হচ্ছে না, সুযোগ দিচ্ছে না পালানোর। ঝটপট সার্চ করা হলো ওদেরকে, তারপর ধমক দিয়ে পথে এনে তোলা হলো।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?' জানতে চাইল রানা।

'কোন প্রশ্ন নয়!' ওর শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে একে-ফরটিসেভেনের বাঁট দিয়ে আঘাত করল একজন গেরিলা। পড়েই যাচ্ছিল, কোনরকমে তাল সামলাল।

প্রচণ্ড গরমের মধ্যে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে ওদেরকে। সূর্যের অবস্থান লক্ষ করছে রানা, সুযোগ পেলেই দেখে নিচ্ছে পাহাড়-প্রাচীরের চূড়াগুলো। পশ্চিম দিকে যাচ্ছে ওরা, নীলনদের কোর্স ধরে সুদান সীমান্তের দিকে। শেষ বিকেলের দিকে আন্দাজ করল দশ মাইল পেরিয়েছে। ইতিমধ্যে উপত্যকার একটা পাশে পৌঁছেছে ওরা, ডালটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। আরও মাইলখানেক এগোবার পর গেরিলাদের ক্যাম্পটা দেখা গেল। কয়েকটা মাত্র একচালা, সেন্ট্রিরা লাইট মেশিন গান নিয়ে সতর্ক হয়ে আছে।

ক্যাম্পের মাঝখানে একটা একচালার সামনে দাঁড় করানো হলো ওদেরকে। ভেতরে নিচু ক্যাম্প টেবিলের ওপর ঝুঁকে ম্যাপ দেখছে তিনজন অফিসার। অফিসারদের মধ্যে কমান্ডারকে আলাদাভাবে চেনা গেল। গেরিলা গ্রুপের লীডার তার কাছে গিয়ে উত্তেজিত ভঙ্গিতে কিছু বলল, ইঙ্গিতে বন্দীদের দেখাল।

সিধে হলো কমান্ডার, বেরিয়ে এল রোদে। লোকটা বেশি লম্বা নয়, তবে চেহারায় এত বেশি গাম্ভীর্য ও কর্তৃত্ব যে সেটা প্রথমে চোখে পড়ে না। কাঁধ দুটো চওড়া, কাঠামোটা চৌকো ও নিরেট। মুখে কোঁকড়ানো কালো দাড়ি, অল্প দু'একটা সাদা। চেহারায় মার্জিত একটা ভাব স্পষ্ট, সুদর্শনও বলতে হবে। চোখ দুটো চঞ্চল ও বুদ্ধিদীপ্ত, দৃষ্টি নিক্ষেপে ক্ষিপ্রতা লক্ষ করার মত। 'আমার লোক বলছে তুমি নাকি আরবী জানো,' রানাকে বলল সে।

'তোমার চেয়ে ভাল জানি, অ্যালান শাফি,' জবাব দিল রানা। 'তা, এই তোমার শেষ পরিণতি? একদল ডাকাতের সর্দার? কিডন্যাপারদের লীডার?'

এক সেকেন্ড হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল অ্যালান শাফি। 'রানা? ওহ্ গড! তোমাকে আমি চিনতে পারিনি? তোমাকে?' হাসছে সে। দুই হাত মেলে দিল, ভাঁজে আটকে বুকে টেনে নিল রানাকে। 'রানা! রানা!' দু'গালে দু'বার চুমো খেলো, তারপর বাহু সমান দূরে ঠেলে দিয়ে মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল। 'এই ব্যাটা আমার প্রাণ বাঁচিয়ে ছিল,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল ওদেরকে। দু'জনেই ওরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। এদিকে গেরিলা দল ততক্ষণে হাওয়া।

'লজ্জা দিচ্ছ, শাফি।'

রানাকে আবার চুমো খেলো শাফি। 'তাও একবার নয়, দু'বার।'

'না, একবারই,' প্রতিবাদ করল রানা। 'দ্বিতীয়বার ভুলে। ওদের গুলিতে তোমাকে মরতে দেয়া উচিত ছিল আমার।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল গেরিলা কমান্ডার শাফি। 'প্রায় পাঁচ-ছয় বছর আগের

কথা, তাই না? তুমি কি এখনও সেনাবাহিনীতে আছ? এতদিনে নিশ্চয়ই জেনারেল হয়ে গেছ!'

'থাকলে হতাম, কিন্তু থাকিনি।'

মেয়ে দুটোর মধ্যে কে জানে কেন রুবিকে মনে ধরেছে শাফির, অন্তত ঘন ঘন তার দিকেই তাকাচ্ছে সে। 'তোমাকে আমি চিনি। কয়েক বছর আগে আদ্দিসে দেখেছি। তখন কিশোরী ছিলে। তোমার বাবা মালডু সিমেন, অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। মেনজিস্টু তাঁকে খুন করে।'

'আমিও আপনাকে চিনি,' বলল রুবি। 'আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস, মেনজিস্টুর বদলে আপনারই ইথিওপিয়ার প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল।' সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল সে।

'সিধে হয়ে, মাথা উঁচু করে দাঁড়াও। কারও সামনে মাথা নিচু করো না।' রানার দিকে তাকাল কমান্ডার শাফি। 'আমার লোকেরা একটু বেশি উৎসাহী, খারাপ ব্যবহার করায় দুঃখিত। তবে আমরা খবর পেয়েছি যে মঠে কিছু লোকজন এসেছে, প্রশ্ন করছে নানা রকম। এসো, রানা, ভেতরে এসো।'

ক্যাম্প ফায়ার থেকে কেটলিতে কফি বানিয়ে আনা হলো, মগে ভরে ধরিয়ে দেয়া হলো হাতে। পুরানো দিনের কথা স্মরণ করল রানা ও শাফি। আফগানিস্তানে জঙ্গী মৌলবাদ বিরোধী গেরিলা ট্রেনিং ক্যাম্পে ট্রেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে রানা, সেখানে সেকিউলারিজমে বিশ্বাসী ইথিওপিয়ান মুক্তি আন্দোলনে জড়িত অ্যালান শাফিও ট্রেনিং নিতে এসেছিল। পরে শাফির অনুরোধ ফেলতে না পেরে ইথিওপিয়ায়ও যেতে হয়েছিল রানাকে, পরোক্ষভাবে হলেও অল্প কিছুদিনের জন্যে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল মেনজিস্টুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে।

তারপর শাফি জানতে চাইল, 'এখানে, আফ্রিকায় তুমি কি করছ, রানা?'

'এসেছি অ্যাবে গিরিখাদে,' রানার জবাব। 'ডিক-ডিক শিকার করব।'

'কি বললে? ডিক-ডিক?' শাফির চোখে অবিশ্বাস। তারপর গলা ছেড়ে হেসে উঠল। 'তুমি? ডিক-ডিক শিকার করবে? তুমি? নাহ্, বিশ্বাস করলাম না। তোমার অন্য কোন মতলব আছে।' পরমুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'কিন্তু তুমি তো কখনও মিথ্যে বলো না!'

'একেবারে বলি না তাই বা বলি কি করে!' অসহায় একটা ভাব করল রানা। 'প্রশ্ন হলো, প্রয়োজনে তোমার সাহায্য পাব কিনা।'

'চাইলেই পাবে। দু'দু'বার জান বাঁচিয়েছ।'

'একবার,' শুধরে দিল রানা।

'এমন কি একবারও যথেষ্ট।'

অনুরোধ ফেলতে না পারায় রাতটুকু গেরিলাদের অতিথি হতে রাজি হলো রানা। কাল সকালে সেন্ট ফ্রুমেনটিয়াস মঠে ওদেরকে পৌঁছে দেবে শাফি। তিমকাত উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে গেরিলাদের নিয়ে তারও সেখানে যাবার কথা। প্রধান পুরোহিত ওলি জারকাস তার বন্ধু। রানা আন্দাজ করল, মঠটা আসলে শাফির ডীপ কাভার বেস। সম্ভবত সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে প্রতিপক্ষ বাহিনীর তৎপরতা

সম্পর্কে তথ্যও পায় সে।

একটা একচালার অর্ধেকটা চট দিয়ে ঘিরে ছেড়ে দেয়া হলো রানা আর নিমাকে, বিছানা তৈরি হলো শুকনো ঘাস বিছিয়ে। মশা তাড়াবার জন্যে ধূপ জ্বালা হলো। নিমা আর রানা কাছাকাছি শুয়েছে, নিমার শরীর চাদরে ঢাকা। ঘরের খোলা, বাইরে ক্যাম্পফায়ারের সামনে বসে থাকতে দেখা গেল শাফি আর রুবিকে।

সেদিকে তাকিয়ে নিচু গলায় নিমা বলল, 'আরবের কোন মেয়ে পরপুরুষের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত একা বসে থাকবে না। বিশেষ করে সে যদি বিবাহিতা হয়।'

'পরস্পরকে চেনে ওরা,' বলল রানা। 'তাছাড়া, আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এক সময় দু'জন দু'জনকে পছন্দ করত। ভালবাসা তো দূরের কথা, স্বামীর কাছ থেকে সামান্য ভদ্র আচরণটুকুও বেচারি পায়নি। এখন শাফি যদি সহানুভূতি জানায়, আগ্রহ দেখায়, রুবির ওখানে বসে থাকাটা অন্যায় হয় কি করে?'

'আমি কি বলেছি অন্যায় হচ্ছে?' হাসল নিমা। 'শুধু ভাবছি, আপনার বন্ধু শাফি কি অসহায় মেয়েটাকে মুক্তির পথ দেখাতে পারবে?'

পরদিন ভোর হবার আগেই রওনা হয়ে গেল গেরিলারা। মার্চ শুরু হলো পুরোপুরি সামরিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে, মূল দলের সামনে ও দু'পাশে থাকল স্কাউটরা। রানাকে শাফি জানাল, গিরিপথের এদিকে খুব কমই আসে আর্মি, তবু তারা সারাক্ষণ সতর্ক থাকে।

চলার পথে রুবির উচ্ছ্বাস আর আবেগ হলো দেখার মত। তার মুগ্ধ দৃষ্টি মুহূর্তের জন্যেও শাফির ওপর থেকে নড়ছে না। নিমার কানে কানে বলল, 'পারলে একমাত্র উনিই আমাদের দেশটাকে এক করতে পারবেন, হাজার বছরেও যে কাজ কেউ পারেনি। ওকে দেখে আমি যেন আমার কৈশোর ফিরে পেয়েছি। আনন্দ আর আশা জাগছে বুকে।'

মঠের কাছাকাছি পৌঁছুতে সারাটা সকাল লেগে গেল। ডানডেরা নদীকে দেখামাত্র গেরিলাদের নিয়ে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল শাফি, মঠে পাঠানো হলো মাত্র চারজন স্কাউটকে। এক ঘণ্টা পর মাথায় বড় আকারের বান্ডিল নিয়ে একদল তরুণ উপাসক এল মঠ থেকে। শাফিকে সমীহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাল তারা, বান্ডিলগুলো রেখে আবার নেমে গেল সরু পথ ধরে গিরিখাদে।

বান্ডিল থেকে বেরুল শিক্ষানবিস সন্ন্যাসীদের উপযোগী ঢোলা আলখেল্লা। গেরিলাদের মধ্যে শুধু যাল্লা ক্রিশ্চান, তারা পরবে। ক্যামোফ্লেজ ফেটিগ খুলে সবাই তা পরছে দেখে ভুরু কুঁচকে শাফির দিকে তাকাল রানা। বুঝতে পেরে হাসল শাফি, বলল, 'মাঝে মধ্যে মুসলমানদের মসজিদেও আমাদেরকে আশ্রয় নিতে হয়, তখন আমরা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান বলি। এখানেও তাই, সবাই আমরা ক্রিশ্চান।'

কথা না বলে হেসে ফেলল রানা। দেখা গেল আলখেল্লার ভেতর শুধু

সাইডআর্মস ভরল গেরিলারা। বাকি সব অস্ত্র ও গোলা-বারুদ পাহাড়-প্রাচীরের গুহায় রেখে যাওয়া হচ্ছে, পাহারায় থাকবে কয়েকজন সেন্ট্রি।

সন্ন্যাসী সেজে রওনা হয়ে গেল গেরিলারা, মঠ আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে। পথ থেকেই বিদায় নিল রানা, মেয়ে দুজনকে নিয়ে ফিরে এল ক্যাম্পে।

রাগে ও হতাশায় ফাঁকা জায়গাটায় পায়চারি করছিল উস্তাভ। 'তুমি একটা খারাপ মেয়েমানুষ!' রুবিকে দেখেই মারমুখো হয়ে ছুটে এল সে। 'সারারাত দেহদান করে এলে!'

'কাল সন্ধ্যায় আমরা পথ হারিয়ে ফেলি,' বলল রানা, গেরিলাদের নিরাপত্তার স্বার্থে উস্তাভকে বলার জন্যে এই মিথ্যে গল্পটা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে শাফি। 'আজ সকালে একদল সন্ন্যাসী আমাদের দেখতে পেয়ে ফিরিয়ে আনে।'

'হারিয়ে তো যাবেনই, মিস্টার!' খেঁকিয়ে উঠল উস্তাভ। 'গাইড হিসেবে আমাকে ভাড়া করেছেন, অথচ আমাকে সঙ্গে নেয়ার কথা উঠলে আপনার অ্যালার্জি হয়! খারাপ মেয়েমানুষ, তোমার সঙ্গে আমার পরে বোঝাপড়া হবে। যাও, কি খাওয়া হবে দেখো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাছতলায় দুপুরের খাবার পরিবেশন করল রুবি। ওরা খাচ্ছে, নিমার হাতে টোকা দিয়ে রানা বলল, 'আপনার সেই ভক্ত হাজির!'

চুপিচুপি কখন এসেছে, কেউ দেখেনি বাটিকে। একটা কুঁড়ের পাশে গুঁড়ি মেরে বসে আছে। নিমা তার দিকে তাকাতেই আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেল মুখ, বোকার সলজ্জ হাসি হাসছে।

'আপনার সঙ্গে বিকেলে আমি বেরুচ্ছি না,' উস্তাভের কান বাঁচিয়ে রানাকে বলল নিমা। 'আশঙ্কা করছি রুবির ওপর আবার আজ অত্যাচার হবে। আপনি বাটিকে নিয়ে যান।'

রওনা হবার সময় নিমার খোঁজে চারদিকে তাকাল বাটি, কিন্তু নিমা তার কুঁড়ে থেকে বেরুল না। অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও, রানার পিছু নিল সে। 'তুমি আমাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাবে,' বলল রানা। 'যেখানে পবিত্র প্রাণীটা থাকে।'

উত্তেজনার নতুন খোরাক পেয়ে রানার সামনে চলে এল বাটি, ফুর্তিতে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে।

ঝুলন্ত ব্রিজ পেরিয়ে এসে আঁকাবাঁকা সরু পথ ধরে এক ঘণ্টা এগোল ওরা। ক্ষয়ের কারণে এবড়োখেবড়ো হয়ে থাকা পাথরের মাঝখানে হারিয়ে গেছে পথটা, চেনাই মুশকিল। কোনও দিকে খেয়াল নেই, লাফিয়ে একের পর এক কাঁটাঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ছে বাটি। এই পাথুরে জমিন আর কাঁটাঝোপের ভেতর দিয়ে আরও প্রায় দু'ঘণ্টা এগোল ওরা। এ-পথে নিমাকে কেন আনতে চায়নি বাটি, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে রানা। নগ্ন হাত দুটো কাঁটায় চিরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে, ট্রাউজারের পায়া ছিঁড়ে গেছে অন্তত দশ জায়গায়। তবে পথটা চিনে রাখছে ও, পরে খুঁজে নিতে পারবে।

অবশেষে আরেকটা রিজের মাথায় চড়ে থামল বাটি, হাত তুলে ওপারটা দেখাল। ওদের নিচে ফাঁক বা গহ্বরের পাঁচিল দেখতে পেল রানা। সেই ফাঁকা জায়গাটাও চোখে পড়ল, ডোরাকাটা খুদে ডিক-ডিক যেখানে বেরিয়ে আসে।

ড্রানডেরা নদীর ওপারে কাঁটাগাছটাও চিনতে পারল, ওটার আড়ালে বসে থাকার সময় শাফির গেরিলারা বন্দী করেছিল ওদের।

বাটিকে বোতল থেকে পানি খেতে দিল রানা, তারপর নিজে খেলো। ঢাল বেয়ে নামার আগে রিগবি রাইফেলটা চেক করল, লেন্স থেকে ধুলো মুছল। চেম্বারে এক রাউন্ড গুলি ভরে সেট করল সেফটি-ক্যাচ। 'আমার পিছনে থাকবে,' নির্দেশ দিল ছেলেটাকে।

ঢাল বেয়ে নামছে রানা, কয়েক কদম পরপর সামনের ও দু'পাশের কাঁটা ঝোপ পরীক্ষা করার জন্যে থামছে। এভাবে ঝর্ণাটার মাথায় পৌঁছে গেল ওরা। এদিকের জমিন নরম ও ভেজা ভেজা। পশু-পাখিরা এখানে পানি খেয়েছে। কুডু আর বুশবাক-এর পায়ের ছাপ চিনতে পারল রানা। তবে ওগুলোর মাঝখানে খুদে হৃৎপিণ্ড আকৃতির ছাপও আছে।

ঝোপ লক্ষ্য করে নিঃশব্দ পায়ে এগোল রানা। ভেতরে ঢুকতেই বিষ্ঠার একটা স্তূপ দেখতে পেল, ডিক-ডিক তার নিজস্ব এলাকার সীমানা চিহ্নিত করনের জন্যে বাউন্ডারি পোস্ট হিসেবে ব্যবহার করে। খুদে বুলেট আকৃতির বিষ্ঠা, ডিক-ডিক এদিকে এলেই স্তূপটা আকারে আরেকটু বড় হয়।

শিকারের খোঁজে মগ্ন হয়ে পড়ল রানা, মনোযোগের মাত্রা দেখলে মনে হবে মানুষখেকো সিংহের পিছু নিয়েছে। প্রতিবার কয়েক ইঞ্চি এগোচ্ছে, পা ফেলার আগে দেখে নিচ্ছে সামনে শুকনো পাতা বা ডাল আছে কিনা, চোখের চঞ্চল দৃষ্টি দ্রুত বেগে আশপাশের ঝোপের ভেতর ঘোরাফেরা করছে।

একটা কান সামান্য একটু নাড়তে ধরা পড়ে গেল ডিক-ডিক। শরীরের অর্ধেকে ছায়া পড়েছে, গায়ের লালচে রঙ পিছনের শুকনো ডালের সঙ্গে মিশে এক হয়ে আছে, এমন স্থির যেন মেহগনি খোদাই করে বানানো একটা মূর্তি। ওই একবার শুধু কান নড়ে ওঠায় ধরা পড়ল অস্তিত্ব। তারপর অবশ্য নাকটাও একটু কোঁচকাল, যেন অস্বস্তিবোধ করছে। সম্ভবত বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তবে জানে না কোনদিক থেকে আসবে।

ধীরে ধীরে রাইফেলটা কাঁধে তুলল রানা। লেন্সের ভেতর দিয়ে দুই শিং-এর মাঝখানের প্রতিটি রোম দেখতে পাচ্ছে। গলা আর মাথার মাঝখানে ক্রস হেয়ার সেট করল, চামড়াটার ক্ষতি করতে চায় না।

'ওই তো, ওই তো!' রানার কনুইয়ের কাছ থেকে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল বাটি! 'সেন্ট জন ব্যাপ্টিস্টকে অভিনন্দন, পবিত্র প্রাণী দেখা দিয়েছে!'

বাদামী ধোঁয়ার মত চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ডিক-ডিক, লেন্স থেকে চোখ সরাবার পর রানা শুধু ঝোপের দু'একটা ডাল সামান্য নড়তে দেখল। কাঁধ থেকে রাইফেলটা ধীরে ধীরে নামিয়ে বাটির দিকে তাকাল ও। 'এটা কি করলে তুমি?'

ধমক খেয়ে মাথা নিচু করল বাটি।

এরপর একাই এগোল রানা, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এল। ক্যাম্পে পৌঁছুতে সন্ধে হয়ে গেল ওদের। ক্যাম্পফায়ারের কাছে থামতে ছুটে এল নিমা। 'কি ঘটল? ডিক-ডিককে দেখা গেছে?'

'আপনার ভক্তকে জিজ্ঞেস করুন। ওই ভাগিয়ে দিয়েছে।'

বাটির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর শুরু করল নিমা। 'তোমাকে নিয়ে সত্যি আমি গর্বিত, বাটি।' শুনে বত্রিশ পাটি দাঁত বের করল ছেলেটা, কুকুরছানার মত লাফাতে লাফাতে মঠের পথ ধরল।

রানার জন্যে কফি নিয়ে এল নিমা, আগুনের সামনে ওর পাশে বসল। বার দুয়েক তাকিয়েই কিছু একটা সন্দেহ হলো রানার, জিজ্ঞেস করল, 'কিছু একটা হয়েছে। কি?'

আগুনের ওদিকে বসে রয়েছে উস্তাভ, চট করে তাকে একবার দেখে নিল নিমা, তারপর রানার আরও কাছে সরে এসে গলা খাদে নামাল, 'শাফির সঙ্গে দেখা করার জন্যে রুবিকে নিয়ে মঠে গিয়েছিলাম। রুবি অনুরোধ করাতেই যেতে হয়েছিল। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো? রুবি একা গেলে উস্তাভ সন্দেহ করবে, তাই।'

'বুঝব না কেন।'

'ওদের দু'জনকে নিরিবিলিতে কথা বলার সুযোগ করে দিই,' বলল নিমা। 'তবে তার আগে ওদের সঙ্গে তিমকাত উৎসব সম্পর্কে আলাপ হয় আমার। উৎসবের পঞ্চম দিনে প্রধান পুরোহিত টাবট নিয়ে অ্যাবেতে নামেন। শাফি আমাকে বললেন, পাহাড়-প্রাচীরের গা বেয়ে পানির কিনারা পর্যন্ত নামার একটা পথ আছে।'

'হ্যাঁ, জানি আমরা।'

'যেটা আপনি জানেন না—নদীতে নামার মিছিলে সবাই থাকে। সবাই মানে, সব্বাই। প্রধান প্রিস্ট, সব ক'জন পুরোহিত, শিক্ষানবিস উপাসকরা, প্রতিটি সত্যিকার বিশ্বাসী, এমন কি শাফি আর তার লোকজনও। শুধু যে নদীতে নামে তাই নয়, রাতটা ওরা ওখানে কাটায়ও। সারাটা দিন ও রাত মঠ একদম খালি পড়ে থাকে।'

হাসি ফুটল রানার মুখে। 'ইন্টারেস্টিং তো!'

'ভুলবেন না, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি,' হিসহিস করে বলল নিমা।

***